কনন্দা-সিরিজ ৭

শরৎ-সাহিত্য-ভবন

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীমনোজ বসু

পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

(কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠাতা)

শরৎ-সাহিত্য-ভবন
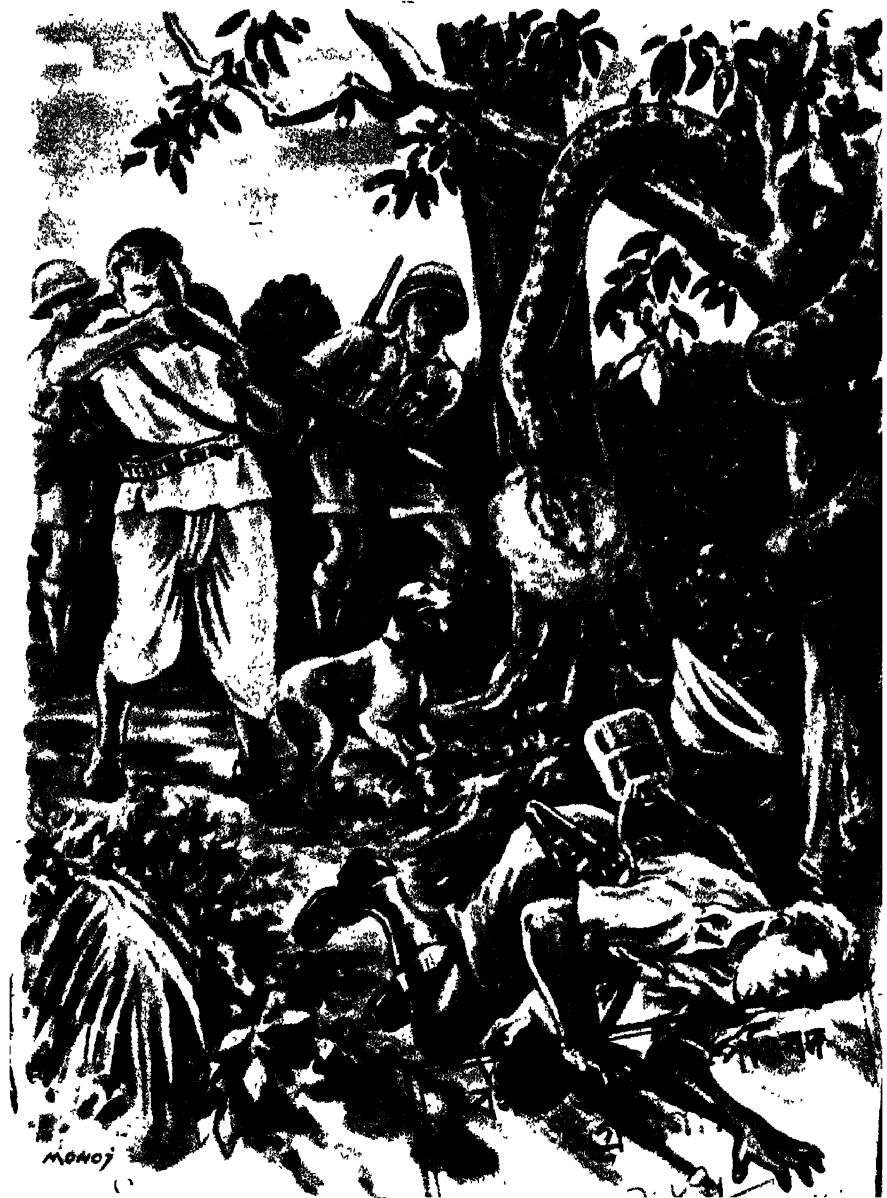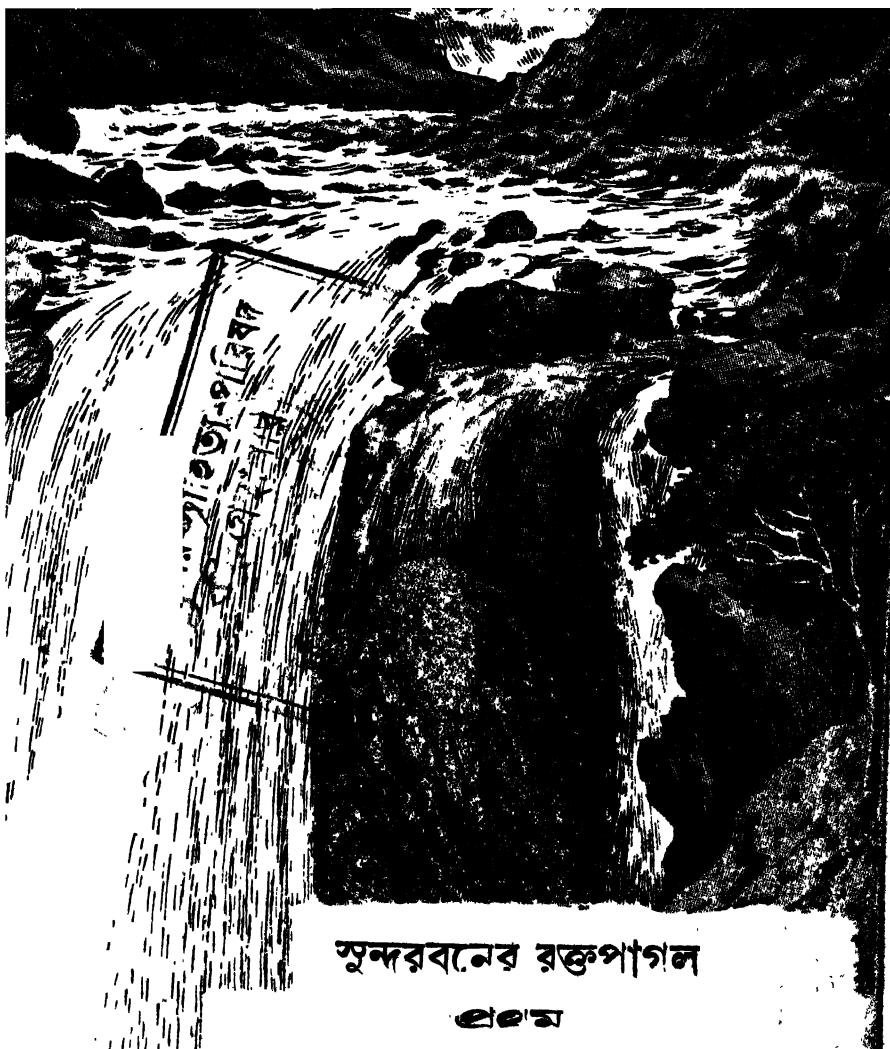
শ্রীমান নবগোপাল লাহিড়ী

ও

শ্রীমান মোহনগোপাল লাহিড়ী

দুই দাদা-ভাইয়ের হাতে

হেমেন-দাদুর

আদরের উপহার

সুন্দরবনের রক্তপাগল

প্রথম

সুন্দরবনে সুন্দরবাবু

বিশাল অরণ্য-সাম্রাজ্য। তরঙ্গিত শ্যামলতার মহাসাগর।

দুর্ভেদ্য জঙ্গলের প্রাচীর—তার ভিতর দিয়ে

যাতায়াতও করতে পারে না মানুষ। আবার ইচ্ছা থাকলেও মানুষ এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করতে ভরসা করে না, কারণ এ হচ্ছে মহা বিপদজনক স্থান। এখানকার প্রধান বাসিন্দা হচ্ছে 'রয়েল বেঙ্গল' ব্যাঘ্র এবং তার উপর আছে 'বয়ার' বা বন্য মহিষ—তারাও এমন হিংস্র যে শিকারীরা তাদের বাঘের চেয়ে কম ভয় করে না। আর আছে পাঁচ-ফুট লম্বা ও তিন-ফুট উঁচু তীক্ষ্ণদন্তধারী ভীষণ বন্য-বরাহ। মাঝে মাঝে আজও গণ্ডারের দেখা পাওয়া যায়। প্রতি পদেই এখানে সর্পভয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অজগর তো আছেই এবং সেই সঙ্গে আছে এত জাতের বিষধর সর্প, পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না যাদের তুলনা। তাদের নামও কত-রকম। ধনীরাজ, দুধরাজ, পাতরাজ, মণিরাজ, ভীমরাজ, মণিচূড়, শঙ্খচূড়, শাঁখামুঠি, নাগরচাঁদ, গোখুরা ও কেউটে প্রভৃতি। এদের প্রত্যেকেরই দংশন হচ্ছে মারাত্মক। কাজেই মানুষ নিতান্ত দায়ে না পড়লে এই ভয়াবহ অরণ্যের ত্রিসীমানায় আসতে রাজি হয় না।

এই বিপুল অরণ্য ভেদ ক'রে যেখান-সেখান দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে বড়, মাঝারি ও ছোট নদ আর নদী এবং খাল আর নালা। সাধারণত এই জলপথের সাহায্যেই মানুষ কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে আনাগোনা করতে পারে। কিন্তু এই জলপথও কিছুমাত্র নিরাপদ নয়। কারণ, নৌকো থেকে নত হয়ে হস্ত-প্রক্ষালনের জন্যে তুমি যদি একবার

সুন্দরবনের

জলস্পর্শ করবার চেষ্টা কর, তাহ'লে
পর-মুহূর্ত্তেই হয়তো নৌকোর উপর থেকে
একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে! এখানকার প্রত্যেক
নদীতে বাস করে অসংখ্য বড় বড় কুমীর! সর্ব্বদাই
তারা সচেতন হয়ে আছে, কখন্ তোমাকে নিজের
কবলগত করবার সুযোগ পাবে ব'লে।

অরণ্যের মাঝে মাঝে আছে ছোট-বড় মাঠ আর জলাভূমি। সে-সব জায়গায় গিয়ে কবিত্ব প্রকাশ করবার কোন উপায়ই নেই। দেখতে সুন্দর হ'লেও সেখানকার বাতাস পর্য্যন্ত বিষাক্ত।

অরণ্যের মধ্যে যেখানে-সেখানে দেখা যায় 'সুন্দরী' গাছের ভীড়। তাদের আকার সুদীর্ঘ, সুকঠিন কাঠের রং লাল। পাতা ছোট ছোট, পাতাগুলির উপরদিক খুব তেলা ও নীচের দিকের রং ধূসর। এ-বনে গাছ আছে আরো অনেক জাতের, তাদের অনেকের নামও বেশ বিচিত্র! যথা—ধোন্দল, গোঁয়ো, বাইন্, কেওড়া, বলা, গরান্, হেন্তাল, গর্জ্জন, গাব ও বনঝাউ। এখানে গোলপাতা ও হোগ্‌লাও দেখা যায় যেখানে-সেখানে।

বলা বাহুল্য, এই পৃথিবীবিখ্যাত অরণ্যের নাম—সুন্দরবন। দক্ষিণ-বাংলা বল্‌তে বোঝায় এই অতি-ভীষণ সুন্দরবনকেই। এই অরণ্যের যেখানে সমাপ্তি সেইখান থেকে আরম্ভ হয়েছে অনন্ত সাগরের চিরন্তন উচ্ছ্বাস!

এই সুন্দরবনের একটি অবৃহৎ নদীর ভিতর দিয়ে চারিদিকের নীরবতাকে শব্দিত ক'রে

…র রক্তপাগল

ছুটে চলেছে একখানি মোটর-বোট। তখন সন্ধ্যাবেলা—যদিও পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে অন্ধকার সেদিন বেরিয়ে আসতে পারেনি বনের ভিতর থেকে। বোটের এখানে-সেখানে ব'সে রয়েছে কয়েকজন দীর্ঘাকার বলবান ব্যক্তি, উর্দ্দি না থাকলেও তাদের দেখে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, তারা পুলিস-ফৌজের অন্তর্গত।

মোটর-বোটের ভিতর ব'সে আছেন এক ব্যক্তি, তাঁর পরোণে ছিল উচ্চতম পুলিস-কর্ম্মচারীর মার্কা-মারা পোষাক। তিনি টুপিটি খুলে রেখেছিলেন ব'লে দেখা যাচ্ছে, তাঁর সারা মাথাটি জুড়ে বিরাজ করছে প্রকাণ্ড একটি টাক। এবং তেমনি প্রকাণ্ড তাঁর ভুঁড়িটি, এমন হৃষ্টপুষ্ট দোদুল্যমান ভুঁড়ি কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর দেহেই শোভা পায় না। বোটের ভিতরে ব'সে তিনি এদিকের ও ওদিকের গবাক্ষ দিয়ে নদীর দুই তীরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করছিলেন বারংবার।

কিন্তু নদীর কোনদিকেই সন্দেহজনক কিছুই দেখা যায় না। নদীর দুইতীরের বনের গাছপালা করছে সুমধুর মর্ম্মরধ্বনি এবং মাথার উপরকার সমুজ্জ্বল আকাশের গায়ে জেগে আছে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির্ম্ময় মুখ। কোথাও মানুষ বা অন্য কোন জন্তুর সাড়া নেই, এমন কি, সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদের কণ্ঠেও এখনো জাগ্রত হয়নি বিভীষণ মৃত্যু-ধ্রুপদ!

নদীর জলকে ফেনায়িত ক'রে সমান ছুটে চলেছে কলের নৌকো। প্রকৃতির আদিম ও

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে কৃত্রিম ও আধুনিক এই মোটর-বোটকে দেখাচ্ছে অত্যন্ত বেমানান। কিন্তু উপায় নেই, যেখানে হবে আধুনিক সভ্যতার পদার্পণ, প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে সেখানেই হবে ছন্দপাত।

আচম্বিতে হ'ল এক ধারণাতীত ব্যাপার! মোটর-বোট বাধা পেয়ে অধিকতর উচ্চস্বরে ক'রে উঠল এক ক্রুদ্ধ গর্জ্জন! কলের নৌকো আর অগ্রসর হ'তে পারলে না।

বোটের ভিতরকার সেই হৃষ্টপুষ্ট লোকটি ব'লে উঠলেন, "হুম্! হ'ল কি? বোটের কল-কব্জা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

বোট যে চালাচ্ছিল সে বললে, "না হুজুর, বোটের সামনে জলের ভিতর থেকে জেগে উঠেছে দু'গাছা মোটা কাছি।"

—"কাছি কি বাপু? জলের ভিতরে কাছিম থাকতে পারে, কিন্তু জলের ভিতর থেকে কাছি ভেসে ওঠে এমন কথাও তো কখনো শুনিনি!"

—"হ্যাঁ হুজুর, জলের ভিতর থেকে ভেসে উঠেছে দু'গাছা কাছি! চেয়ে দেখুন, কাছি দু'গাছা নদীর এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত চ'লে গিয়েছে। ও কাছি কারা ধ'রে আছে জানি না, কিন্তু তারা বোধহয় আমাদের বাধা দিতে চায়!"

—"বাধা দিতে চায়? হুম্! তাহ'লে ব্যাপারটা বেশ বোঝাই যাচ্ছে! যাদের ধরবার জন্যে আমরা এসেছি এ-অঞ্চলে, তারাই বোধহয় আমাদের ধরবার

ফিকিরে আছে! বোটের মুখ ফেরাও, বোটের মুখ ফেরাও! যেদিক থেকে আসছি আবার সেইদিকে ফিরে চল!"

বোট কিন্তু মুখ ফিরিয়েও মুক্তিলাভ করতে পারলে না। কারণ ইতিমধ্যে ওদিকেও জেগে উঠেছে আরো দু'গাছা মোটা মোটা কাছি! বোটের এখন এদিক বা ওদিক কোনদিকেই যাবার উপায় নেই!

হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিটির ললাটদেশ তখন ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছে। রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে এবং হাঁসফাঁস করতে করতে ভিতর থেকে বাইরে এসে তিনি বললেন, "পঁচিশ বছর পুলিসে চাকরি করছি! এমনভাবে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতন মরতে আমি রাজি নই! আমি এখনি জলে ঝাঁপ খাব!"

এক ব্যক্তি বললে, "সে কি স্যর! জলে ঝাঁপ খাবেন কি? শুনেছি আপনি তো সাঁতার জানেন না!"

—"হুম্! সাঁতার জানিনা বটে, কিন্তু তোমরা ভেবেছ কি আমি হচ্ছি নিতান্ত নাবালক? আমার জামার তলায় আছে জলে ভেসে থাকবার পোষাক! স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে অনায়াসেই আমি বিপদের বাইরে গিয়ে পড়তে পারব— কিছুতেই আমি ডুব্‌ব না। বাপু হে, জলপথে যখন শত্রুপুরীতে এসেছি, তখন কি আমি প্রস্তুত হয়ে আসিনি মনে কর?"

—"কিন্তু স্যর, এখানকার নদীতে

'কিল্‌বিল্‌ করে কুমীরের দল! তাদের কেউ-না কেউ আপনাকে কোঁৎ ক'রে গিলে ফেলবে!"

—"ধেৎ, বোকারাম কোথাকার! তুমি কি জানো না মানুষ যতক্ষণ জলে সাঁতার কাটে, কুমীর তাকে ধরতে পারে না? মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই কুমীর তার লক্ষ্য স্থির ক'রতে পারে!"

হঠাৎ আর-একজন ব'লে উঠল, "হুজুর, নদীর দু' তীরের দিকে তাকিয়ে দেখুন! ওদিক্‌ থেকে দু'খানা আর এদিক থেকে দু'খানা নৌকো তর্‌তর্‌ ক'রে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।"

—"ওরা আমাদেরই বন্দী করতে আসছে! এইবারে আমি জলে ঝাঁপ খাব!"

—"কিন্তু স্যর, আপনি তো জলে ঝাঁপ খেয়ে হয় পাতালে, নয় কুমীরের পেটে গিয়ে হাজির হবেন! আমরা এখন কি করি?"

—"সাঁতার জানা থাকে তো জলে ঝাঁপ খাও, নয়তো বোম্বেটেদের হাতে ধরা দাও! এ-সময়ের মূলমন্ত্র কি জানো? চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা!"

—"না স্যর, আমরা ওদের হাতে ধরা দেব না, আমরা ওদের সঙ্গে লড়াই করব!"

—"দলে ওরা ভারি, ওদের সঙ্গে লড়াই ক'রে সুবিধে ক'রে উঠতে পারবে কি? বেশ, তোমাদের যা-খুসি তাই কর, আমি কিন্তু জলে ঝাঁপ খেলুম। জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা! শ্রীচরণে ঠাঁই দিও মা! ঝুম্‌!"

সুন্দরবনের রক্তপাগল

দ্বিতীয়

সব-চেয়ে বিস্ময়কর

সেদিন এখানে চায়ের আসরে অতিরিক্ত ঘটা। কারণটা হচ্ছে, জয়ন্ত ও মাণিক করেছে আজ বিমল ও কুমারকে প্রভাতী-চায়ের নিমন্ত্রণ !

জয়ন্ত জানত বিমল, কুমার, রামহরি ও বাঘা—এরা সবাই হচ্ছে একই পরিবারের অন্তর্গত। কাজেই বিমল ও কুমারের সঙ্গে এসেছিল রামহরি এবং বাঘাও।

এবং রামহরির রন্ধনের হাত অত্যন্ত সুপটু ব'লে নিমন্ত্রিত হয়েও তাকে ঢুক্‌তে হয়েছিল রন্ধনশালায়, জয়ন্ত ও মাণিকের বিশেষ অনুরোধে।

প্রভাতী-চায়ের আসর হ'লে কি হয়, রামহরি সেদিন প্রস্তুত করেছিল অনেক-রকম খাবার।

ইতিমধ্যে খাবারের ছোট এক-দফা হয়ে গেল—গরম গরম টোষ্ট, এগ-পোচ্ এবং চা।

চায়ের পেয়ালায় চামচে দিয়ে চিনি মেশাতে মেশাতে জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, কুমারবাবু, আপনারা তো পৃথিবীর জানা-অজানা বহু দুর্গম দেশে বেড়িয়ে এসেছেন। এমন কি পৃথিবীর বাইরে মঙ্গল-গ্রহে গিয়েও পদার্পণ করতে ছাড়েন নি। কিন্তু বলতে

পারেন কি, আপনারা সব-চেয়ে বিস্ময়কর কী দেখেছেন ?”

বিমল একটা চুমুক দিয়ে চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে, “সব-চেয়ে বিস্ময়কর কী দেখেছি ? কুমার, তুমি এ-প্রশ্নের কি উত্তর দিতে চাও ?”

কুমার হাসতে হাসতে বললে, “জীবনে আমার কাছে সব-চেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছে, আমাদের এই বাঘা !”

মাণিক বললে, “বাঘা ? শুনেছি আপনারা ময়নামতীর মায়াকাননে গিয়ে আদিম পৃথিবীর অতিকায় জীব ডাইনসর প্রভৃতির সঙ্গেও আলাপ ক'রে এসেছেন। বাঘা কি তাদের চেয়েও আশ্চর্য্য ?”

বিমল উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, “নিশ্চয়, নিশ্চয় ! বাঘার চেয়ে আশ্চর্য্য কোন-কিছু আমিও জীবনে দেখিনি !”

জয়ন্ত বললে, “বাঘাকে আপনি ভালোবাসেন, তাই ও-কথা বলছেন ! লোকে যাকে ভালোবাসে, তাকেই সব-চেয়ে-বড় ব'লে মনে করে। ঐ তো একটা দেশী কুকুর—”

বিমল বাধা দিয়ে ব'লে উঠল, “জয়ন্তবাবু, আপনার মতন বুদ্ধিমান লোকও যদি গোলাম-মনোবৃত্তির পরিচয় দেন, তাহ'লে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হব। সাদা-চামড়ারা এই কালো বাংলা দেশ আর এই কালো বাঙালীকে ঘৃণা করে ব'লে এ-দেশের কুকুর

বাঘাও কি হবে ঘৃণ্য জীব? বাঘাকে আপনারা এখনো চেনবার সুযোগ পাননি। কুকুর হ'লেও সে হচ্ছে অদ্ভুত, বাংলার গৌরব! য়ুরোপ-আমেরিকার যে-কোন 'পেডিগ্রি-ডগে'র চেয়েও সে হচ্ছে উচ্চতর শ্রেণীর জীব! বাঘাকে আমরা যদি হুকুম দি, তাহ'লে সে একলাই সিংহেরও উপরে গিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। কত বড় বড় সাংঘাতিক বিপদ থেকে বাঘা আমাদের উদ্ধার করেছে, সে-কথা তো আপনারা জানেন না! বাঘাকে আমরা অধিকাংশ মানুষেরই চেয়ে শ্রদ্ধা করি!"

কুমার বললে, "সুধু আমরা নই, বাংলার কবি ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত অনেক-কাল আগেই ব'লে গিয়েছেন:

'কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'—

জয়ন্তবাবু, বাঘা হচ্ছে বাংলার কুকুর, কিন্তু তার ভিতরে গোলাম-মনোবৃত্তি নেই। ঠিকমত যত্ন করলে আর পালন করতে পারলে বাংলার নিজস্ব কুকুরও যে কতখানি অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, বাঘা হচ্ছে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ!"

ঘরের এক প্রান্ত দিয়ে একটা নেংটি ইঁদুর ল্যাজ তুলে তীরের মত কোণের ঐ আলমারিটার তলায় গিয়ে ঢুকেছিল, বাঘা এতক্ষণ ছিল তাকেই পুনরাবিষ্কার করবার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত! কিন্তু পলাতক ইঁদুরের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। বাঘা ইঁদুরকে ধরবার

চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু সজাগ কানে বারবার শুনছিল তার নিজেরই নাম! অতএব ইঁদুরকে ত্যাগ ক'রে সে এখন তার মনিবদের কাছে যাওয়াই উচিত মনে করলে।

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "কিরে বাঘা, তুই আবার কি বলতে চাস্?"

বাঘা প্রবল বেগে লাঙ্গুল আস্ফালন ক'রে একটি লাফ মেরে বললে, "ঘেউ, ঘেউ!"

বিমল হেসে ফেলে বললে, "বাঘা রে, তুই দিশী-কুকুর ব'লে জয়ন্তবাবু আর মাণিকবাবু তোকে মানতে রাজি হচ্ছেন না। তুই একবার ওঁদের ধম্‌কে দে তো!"

বাঘা তখনি জয়ন্ত আর মাণিকের দিকে ফিরে দাঁত-খিঁচিয়ে গম্ভীর স্বরে গর্‌র্ গর্‌র্ ক'রে গর্জ্জন ক'রে উঠল।

জয়ন্ত হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "ব্যাস্, বিমলবাবু! আপনাকে আর-কিছু প্রমাণিত করতে হবে না! বাঘা যে গেল-জন্মে মানুষ ছিল, আর এ-জন্মেও তার কুকুর-দেহের ভিতরে যে মানুষের আত্মা বর্ত্তমান আছে, এ-কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য হচ্ছি! দ্বারপথ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, বারান্দা দিয়ে রামহরি আর মধু আসছে খাবারের 'ট্রে' হাতে ক'রে! অতএব মুখ দিয়ে এখন বাক্য ত্যাগ না ক'রে খাদ্য গ্রহণ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ!"

ঠিক এইসময়েই শোনা গেল সিঁড়ির

সুন্দরবনের রক্তপাগল

উপর দিয়ে ভারি ভারি দ্রুত-চলা

আমি চিনি।

নেই মনে হচ্ছে

ব্যাপার বড় গুরুতর!”

—বলতে বলতে সুন্দরবাবু এসে হাজির হ'লেন সেই ঘরের দ্বারদেশে।

মাণিক বললে, “চতুষ্পদ জীবদের নাসিকার শক্তি নাকি মানুষদেরও চেয়ে প্রখর! কিন্তু সুন্দরবাবু, আপনার ঘ্রাণশক্তি তাদেরও হার মানাতে পারে!”

সুন্দরবাবু মাথার টুপী খুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, “এ-কথার মানে কি মাণিক?”

—“মানেটা হচ্ছে এই যে, আজ আমাদের এখানে পানাহারের বিশেষ আয়োজন হয়েছে, এ-কথাটা আপনি জানতে পারলেন কেমন ক'রে?”

সুন্দরবাবু ধুপ্ ক'রে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে বললেন, “হুম্! পানাহার! পানাহার করতেই আমি এখানে এসেছি বটে! পরপারে যেতে যেতে কোন-রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আজ আমি তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি! প্রাণ থাকলে লোকে পেটের কথা ভাবে, আমি এখন পেটের কথা মোটেই ভাবছি না!”

মাণিক বললে, “তাহ'লে আপনি কি

আজ এখানে দয়া ক'রে কিছুই গ্রহণ করবেন না ?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমি কি তাই বলছি ? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। খাবার তৈরি থাকলে যে খেতে রাজি হয়না আমার মতে সে হচ্ছে—নরাধম !"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, হাসি-ঠাট্টার কথা থাক্, আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, আপনি আজ এখানে বেড়াতে-বেড়াতে খাবার খেতে আসেন নি। ব্যাপার কি বলুন তো ?"

সুন্দরবাবু সাগ্রহে একখানা 'ফ্রেঞ্চ্ কাটলেট'কে আক্রমণ ক'রে বললেন, "বলছি ভায়া, বলছি ! এমন ব্যাপার আমি আর কখনো দেখিওনি শুনিওনি ! তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি কোন কাজ করি না, জানো তো !......আরে, হুম্ বিমলবাবু ? কুমারবাবু ? আপনারাও আজ এখানে হাজির আমার ভাগ্য দেখছি খুব ভালো !...আরে, সেই বিচ্ছিরি নেড়ি-কুত্তাটাকেও সঙ্গে ক'রে এনেছেন দেখছি যে ! আর ব্যাটা আর-সবাইকে ছেড়ে ঠিক আমার দিকেই কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে আছে ! মশায়, ও-কুকুরটা আমার দিকে অমন্ ক'রে তাকিয়ে থাকলে আমি ভারি নার্ভাস্ হয়ে যাই। ওকে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে বলুন।"

কিন্তু বাঘাকে মানা করতে হ'ল না, হঠাৎ নীচে থেকে রামহরির ডাক শুনে এক দৌড় মেরে ঘরের বাইরে

নর রক্তপাগল

খানিকক্ষণ পরে ভোজন-পর্ব্ব শেষ হ'ল। সুন্দরবাবু উঠে গিয়ে একখানা আরামপ্রদ সোফার উপর ব'সে এক পায়ের উপরে আর এক পা তুলে দিয়ে আগে একটি সুদীর্ঘ 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করলেন। তারপর একটি চুরোট ধরিয়ে হুস্ ক'রে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে সুরু করলেন তাঁর কাহিনী :

সুন্দরবনের ভিতরে দেখা দিয়েছে এক আধুনিক দেবী চৌধুরাণী। তাকে এখনো কেউ চোখে দেখেনি, সবাই শুনেছে কেবল তার কণ্ঠস্বর।

জয়ন্ত, তুমি জানো সুন্দরবনের ভিতরে নানা-শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা র্বদাই যাতায়াত করে। আর সুন্দরবনের ভিতরে মানুষের াতায়াতের প্রধান পথ হচ্ছে জলপথ। এত নদী-নালা বোধহয় থিবীর আর কোন দেশের কোন অরণ্যেই নেই। সুন্দরবনের ঙ্গল নানা স্থানেই এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, তার ভিতরে মানুষ প্রবেশ রবে কি, দিন-দুপুরে প্রখর সূর্য্যালোকও প্রবেশ করতে পারে া। জঙ্গল যেখানে পাৎলা সেখানেও মানুষের পক্ষে নিরাপদ য়। হয়তো গাছের উপরে দুলতে থাকে মোটা-মোটা অজগর বং গাছের তলায় মানুষের জন্যে অপেক্ষা করে ব্যাঘ্রাচার্য্য হলাঙ্গুল। এবং সেইসঙ্গে আরো অনেক-রকম চতুষ্পদ ীব আর বুকে-হাঁটা বিষাক্ত সরীসৃপও আছে। তবু মোম, ধুর সংগ্রাহক আর কাঠুরিয়াদের জঙ্গলের ভিতরে ায়ে হেঁটে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় কিন্তু

নেই। যাদের বাধ্য হয়ে পদব্রজে সুন্দরবনের ভিতরে প্রবেশ করতে হয়, তারা মোব্রা-গাজীর বংশধর নামে খ্যাত ফকিরদের কাছে গিয়ে আগে আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই ফকিররা নাকি মন্ত্রগুণে ব্যাঘ্র বা কুমীরের হিংস্র দৃষ্টি মানুষদের উপরে পড়তে দেয় না।

যাক্ সে কথা। এখন জলপথের কথাই হোক্। বলেছি সুন্দরবনের জলপথে নৌকোয় চ'ড়ে নানা-শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা সর্ব্বদাই আসা-যাওয়া ক'রে থাকে। কিন্তু হঠাৎ এই-সব জলপথ হয়ে উঠেছে বিপদ্‌জনক—এমন কি সাংঘাতিক।

ধরো, কোন ধনী-ব্যবসায়ীর নৌকো সুন্দরবনের কোন একটা নদীর ভিতর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। যেতে যেতে নৌকো-আরোহীরা দেখলে দূর থেকে বেগে আর-একখানা বড় নৌকো (বা সময়ে সময়ে দ্রুতগামী ছিপ্) বেগে তাদের কাছে এসে হাজির হ'ল।

সেই বড় নৌকো বা ছিপের উপর থেকে একজন লোক চেঁচিয়ে ব্যবসায়ীদের নৌকোর চালককে ডেকে বললে, "মাঝি, একটু আগুন কি দেশলাই আছে ভাই? আমাদের আগুন কি দেশলাই নেই, আমরা তামাক খেতে পাচ্ছি না।"

ব্যবসায়ীদের নৌকোর মাঝি আগুন বা দেশলাই দিয়ে নবাগতকে সাহায্য করতে উদ্যত হ'ল।

কিন্তু যেই সে হাত বাড়িয়ে নূতন নৌকোর

আগুন বা দেশলাই দিতে গেল, অমনি অপর নৌকোর উপর থেকে কেউ তার হাত ধ'রে টান মেরে তাকে একেবারে জলের ভিতরে ফেলে দিলে। মাঝিহীন নৌকো আর অগ্রসর হ'তে পারলে না। সেই সুযোগে নূতন নৌকোর উপর থেকে যমদূতের মতন দশ-বারো জন লোক বাঘের মতন লাফ মেরে ব্যবসায়ীদের নৌকোর উপরে এসে পড়ল—তারা সকলেই সশস্ত্র। কেবল তরোয়াল বা ছোরা নয়, তাদের সঙ্গে থাকে বন্দুক আর রিভলভার পর্য্যন্ত।

তারপর তারা ব্যবসায়ীদের নৌকোর সমস্ত আরোহীকে আক্রমণ করে। তারা এমন নির্দ্দয় যে, কারুকেই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দেয় না। সকলকেই খুন ক'রে তাদের সঙ্গে টাকাকড়ি বা মূল্যবান যা-কিছু থাকে সমস্তই লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যায়। এমন কি নৌকোখানাকে পর্য্যন্ত ছাড়ে না। সেখানাকেও তাদের নৌকোর সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যায় কোথায়, তা কেউ জানে না।

মাঝে মাঝে আক্রান্ত-ব্যবসায়ীদের নৌকোর ভিতর থেকে দু-একজন লোক কোন-গতিকে জলে ঝাঁপ্ খেয়ে সাঁতার দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। তাদের মুখ থেকেই জানতে পেরেছি বোম্বেটেদের এই আক্রমণ-প্রণালী।

জয়ন্ত, এই আক্রমণের কৌশলটা নূতন নয়। হয়তো তুমি জানো, এদেশে যখন ইংরেজ-শাসনের আরম্ভ, ডাকাত আর বোম্বেটেদের অত্যাচারে

বাংলাদেশ তখন ছিল প্রায় অরাজকের মতন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাকাত আর বোম্বেটেদের তখন আলাদা ক'রে ভাবা হ'ত না। বাংলা দেশ নদী-প্রধান ব'লে স্থলপথের দস্যুরা তখন প্রায়ই সাহায্য গ্রহণ করত জলপথের। সে-সময়কার ডাকাত বা বোম্বেটেরা যখন কোন নৌকোর উপরে এসে হানা দিত, তখন সুন্দরবনের এই আধুনিক বোম্বেটেদের মতই প্রথমে গোড়া ফেঁদে বলত, 'মাঝি, একটু আগুন দেবে ভাই?' দেখা যাচ্ছে, এই আধুনিক বোম্বেটেরা আবার সেই পুরাতন কৌশলই অবলম্বন করতে চায়।

কিন্তু আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার কি জানো? সুন্দরবনে ব্যবসায়ীদের প্রত্যেক নৌকোই যখন আক্রান্ত হয়েছে, তখন শুনতে পাওয়া গেছে এক তীব্র আর তীক্ষ্ণ—নারীকণ্ঠ! বোম্বেটেরা সকলেই সেই নারীকণ্ঠেরই আদেশ পালন করে।

অথচ সেই নারী যে কে, আজপর্য্যন্ত কেউ তা দেখেনি। আজকাল ছিপের ব্যবহার নেই, কিন্তু এই বোম্বেটেরা মাঝে মাঝে ব্যবহার করে সেই সেকেলে ছিপ। এ-শ্রেণীর নৌকো—অর্থাৎ ছিপের উপরে কোন-রকম ছাউনি থাকে না, সকলেই তা জানে। কিন্তু ছিপের উপরে এখন পর্য্যন্ত কেউ কোন স্ত্রীলোককে দেখতে পায়নি। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি, বিংশশতাব্দীর এই আধুনিক দেবী চৌধুরাণী হত্যা ও লুণ্ঠন করে পুরুষের ছদ্মবেশের আড়ালেই।

সুন্দরবনের রক্তপাগল

কর্ত্তাদের হুকুম হয়েছিল, যেমন ক'রে হোক্ আমাকে এই অতি-নৃশংস দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করতেই হবে। কারণ সুন্দরবনের জলপথে আজকাল নাকি ব্যবসায়ীদের নৌকোর আনাগোনা বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। আজপর্য্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে নাকি পাঁচশতেরও বেশী লোক। কর্ত্তাদের হুকুম অবশ্য আমার ভালো লাগেনি মোটেই। যত-সব মারাত্মক মামলার ভার আমার ঘাড়েই বা পড়বে কেন? কিন্তু উপায় নেই, আমি হচ্ছি মাইনের চাকর। হুম্! আর বেশীদিন দেরি নেই। পেন্সন্ নিতে পারলেই বাঁচি!

দলবলসুদ্ধ দেবী চৌধুরাণীকে পাকড়াও করবার জন্যে যেতে হ'ল আমাকে। সেপাইদের নিয়ে মোটর-বোটে চ'ড়ে দিন-পনেরো ধ'রে সুন্দরবনের নানা নদী-নালাতে ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম। কিন্তু একটা বোম্বেটেরও চুলের টিকি পর্য্যন্ত দেখতে পেলুম না। এমন কি এ-কয়দিনের ভিতরে কোন ব্যবসায়ীর নৌকোই বোম্বেটের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলুম, দেবী-চৌধুরাণী-বেটী তার দলবল নিয়ে বোধহয় পুলিসের ভয়ে সুন্দরবন ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।

হায়রে কপাল! পরশু রাত্রেই ভালো ক'রেই টের পেয়েছি, আমার সে-বিশ্বাস হচ্ছে একেবারেই বাজে বিশ্বাস! হুম্! পরশু রাত্রের কথা ভাবতেও আমার পিলে চমকে যাচ্ছে এখনো। উঃ, সে কী ব্যাপার!

সুন্দরবনের রক্তপাগল

একেলে দেবী চৌধুরাণী-বেটী কি ধড়ীবাজ মেয়ে রে বাবা!

মোটর-বোটে চেপে ফিরে আসছিলুম কলকাতার দিকে। আকাশে ছিল চাঁদের আলো, বাতাসে ছিল ফুলন্ত সবুজ পাতার গন্ধ। নদীর জল চাঁদের আলোর লক্ষ লক্ষ হীরের টুকরো নিয়ে লোফালুফি করতে করতে তর্ তর্ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছিল গান গাইতে, গাইতে। জয়ন্ত, তুমি বিশ্বাস করবে না, হঠাৎ আমার প্রাণে জাগল কবিত্ব! হঠাৎ আমি আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠলুম, রবিঠাকুরের "ও আমার চাঁদের আলো" ব'লে সেই গানটা! কিন্তু পুলিসের পক্ষে কবিত্ব যে কি সাংঘাতিক জিনিষ, সেটা টের পেতে বিলম্ব হ'ল না।

কবিত্বের জোয়ারে ভেসে যেই অন্যমনস্ক হয়েছি, আচম্বিতে আমাদের মোটর-বোটের আগে আর পিছনে জেগে উঠল দু'গাছা দু'গাছা ক'রে চারগাছা দড়ির বাধা! আমাদের বোটের এগুবার আর পিছোবার দুই পথই বন্ধ। জলের ভিতরে চারগাছা মোটা কাছি ডুবিয়ে দুই তীরে অপেক্ষা করছিল একেলে দেবী-চৌধুরাণীর দল। বোটকে কবলে পেয়েই তারা ক'রে ফেললে সেখানাকে একেবারেই বন্দী!

কিন্তু হুঁ-হুঁ বাবা, আমি হচ্ছি শত-শত যুদ্ধজয়ী প্রাচীন পুলিস-কর্ম্মচারী! এত সহজে আমাকে কি হস্তগত করা যায়? জলপথে যাচ্ছি, অথচ আমি সাঁতার জানি না। যদি কোন অঘটন ঘটে,

[illegible]নের রক্তপাগল

অগাধ জলের মধ্যে তলিয়ে যাব আড়াইমণ ওজনের নিরেট লোহার জিনিষের মত। কাজেই সুন্দরবনের নদীতে নদীতে বেড়াবার সময় আমার ইউনিফরমের তলায় এমন মজার পোষাক পরেছিলুম যে, আড়াই-মণ তিন-মণ ওজনের বৃহৎ মানুষকেও তা পাতালের দিকে তলিয়ে যেতে দেয়না কিছুতেই।

অম্লানবদনে খেলুম জলে ঝাঁপ! সেই মোটর-বোটের আর আমার দলের লোকদের কি যে হাল হ'ল, তার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু আমি ক্ষরস্রোতা নদীর টানে ভেসে চললুম রীতিমত দ্রুতবেগে! তারপর বোধহয় মাইল-কয়েক পথ পার হয়ে ভাসতে ভাসতে উঠলুম গিয়ে নদীর এক তীরে।

তীরে উঠেই শুনলুম, খানিক তফাৎ থেকে এক ব্যাঘ্র গাইছে হালুম্-হুলুম্ রাগিণী! বোম্বেটেরা ভালো কি বাঘরা ভালো তা নিয়ে আমি মনে মনে আলোচনা করবার কোন সুযোগ পেলুম না। হুম্! আমি প্রাণপণ চেষ্টায় চ'ড়ে বসলুম একটা বড় গাছের উঁচু ডালের উপরেই।

সেখানে আবার-এক নতুন বিপদ! বিষম কিচির-মিচির আওয়াজ শুনেই বুঝলুম সেই গাছের ডালে ডালে বাস করে বোধহয় শত-শত বাঁদর! মনে হ'ল, গভীর রাত্রে এই অনাহুত মানুষ-অতিথিকে দেখে সেই শত-শত বানরের দল যেন আশ্রয় দিতে মোটেই

প্রস্তুত নয়। গাছের ডালের উপর শব্দ শুনেই আন্দাজ করলুম, তাদের কেউ কেউ যেন আসছে আমাকে আক্রমণ করতে! জলে স্থলে শূন্যে গাছের ডালেও আমার জন্যে আজ দেখছি অপেক্ষা ক'রে আছে কেবল বিপদের পর বিপদ! মেজাজ ভীষণ গরম হয়ে উঠল! আর কোন দয়া-মমতা না ক'রে চতুর্দ্দিকে করতে লাগলুম রিভলভারের গুলিবৃষ্টি! রিভলভারের কি মহিমা! অতবড় গাছটা হয়ে গেল একদম নিঃশব্দ! কেবল গাছের তলায় মাটির উপরে শুনতে লাগলুম ধুপ্ধাপ্ শব্দের পর শব্দ! বুঝলুম, বানরের দল এ-গাছের বাসা ছেড়ে মাটির উপরে লাফ মেরে স'রে পড়ছে অন্য কোথাও!

বাঁদরের দল তো গেল ভাই, এল আবার নতুন শত্রুর দল! তারা আবার এমন শত্রু যে, কামান দাগলেও ব্যর্থ হবে গোলা ছোঁড়া! এই হতভাগ্য সুন্দরবাবুকে আক্রমণ করলে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে ভয়াবহ মশারা মনের সুখে পোঁ-পোঁ রাগিণী ভাঁজতে ভাঁজতে। সে-যে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড, কলকাতায় ব'সে তোমরা তা আন্দাজ করতে পারবে না। আমি বলছি তা যে অত্যুক্তি নয়, এখনো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে তোমরা সেটা কতক আন্দাজ করতে পারবে! বারবার মনে হয়েছিল ডাকুক-গে সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ, মারি লাফটা আবার মাটির উপরে! যাক্, বুদ্ধিমানের মত সে-ইচ্ছা দমন ক'রে ফেলেছিলুম।

কিন্তু জয়ন্ত, একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। যদিও আমি কোন নারীকে দেখতে পাইনি, কিন্তু নৌকোর উপর থেকে ঝাঁপ্ খেয়ে আমি যখন অগাধ জলের উপরে ভাসছি, নদীর এক তীর থেকে তখন শুনতে পেয়েছিলুম, খন্‌খনে মেয়ে-গলায় খল-খল অট্টহাসির পর অট্টহাসি! সে যে নারীর কণ্ঠ তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু পৃথিবীর কোন নারীর কণ্ঠই যে সে-রকম বীভৎস, নিষ্ঠুর আর হিংস্র অট্টহাসি হাসতে পারে, আমি কখনো স্বপ্নেও তা ধারণায় আনতে পারিনি। ভয়ানক বন্ধু, ভয়ঙ্কর! সেই কুৎসিত হাসির ভিতরে জেগে উঠেছিল যেন দুনিয়ার সমস্ত পাপ আর শয়তানি। হুম্!"

সুন্দরবনের রক্তপাগল

তৃতীয়

নতুন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ

জিজ্ঞাসু-চোখে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্তও খানিকক্ষণ মুখ নামিয়ে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, "বিমলবাবু, কুমারবাবু, সব তো শুনলেন সুন্দরবাবুর মুখে। আপনাদের কি মনে হয়?"

বিমল বললে, "বাংলা দেশে মেয়ে-বোম্বেটের কথা এই প্রথম শুনলুম।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কেন, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে আপনি কি দেবী চৌধুরাণীর কথা পড়েন নি?"

বিমল বললে, "পড়েছি। যদিও দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক আছে, তবু ঐ নারী-চরিত্রটিকে নিয়ে বঙ্কিমবাবু লিখেছিলেন—কাল্পনিক উপন্যাস। আর ইতিহাসের কি উপন্যাসের দেবী চৌধুরাণী মেয়ে-বোম্বেটে ছিলেন না। রংপুর অঞ্চলে যখন একবার চাষারা বিদ্রোহী হয়, দেবী চৌধুরাণী আর ভবানী পাঠক প্রভৃতির নাম শোনা গিয়েছিল সেইসময়ে। ভবানী পাঠক যে-কালীর প্রতিমাকে পূজো করতেন, ও-অঞ্চলে এখনো তা বিদ্যমান আছে। আমি আর কুমার সেই প্রতিমাকে স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

কিন্তু সুন্দরবাবু, আজ যে মেয়ে-বোম্বেটের কথা বললেন, আমার কাছে তা অত্যন্ত অদ্ভুত ব'লেই মনে হ'ল।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কেন, অদ্ভুত ব'লে মনে হ'ল কেন? আপনি কি জানেন না এই কলকাতা-সহরেই নামজাদা মেয়ে-গুণ্ডা আছে? মেয়ে-গুণ্ডা যখন থাকতে পারে, মেয়ে-বোম্বেটেই-বা থাকবে না কেন? হুম্! এই পৃথিবীটা হচ্ছে এক আজব জায়গা, এখানে অসম্ভব কিছুই নেই।"

বিমল বললে, "আমি আপনার কথার প্রতিবাদ করছি না সুন্দরবাবু। ব্যাপারটা অদ্ভুত ব'লে মনে হচ্ছে, তাই বললুম।"

কুমার বললে, "মেয়েই হোক্ আর পুরুষই হোক্, প্রত্যেক বোম্বেটের পিছনে কিছু-না-কিছু পূর্ব্ব-ইতিহাস থাকেই। পুলিসের কর্ত্তব্য হচ্ছে, আগে সেই ইতিহাসের খবর নেওয়া। কোন মেয়ে-বোম্বেটে হঠাৎ আকাশ থেকে খ'সে পড়তে পারে না। বোম্বেটে রূপে দেখা দেবার আগে নিশ্চয়ই সে অন্য কোন-না-কোন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পুলিসের খাতায় আপনি ঐ মেয়ে-বোম্বেটের কোন পূর্ব্ব-ইতিহাস পেয়েছেন কি?"

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "কিছুই পাইনি। ঐ যা বললেন, এই বোম্বেটে-বেটী ঠিক যেন আকাশ থেকেই খ'সে পড়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবন অঞ্চলে কোন মেয়ে-বোম্বেটের যে আবির্ভাব হয়েছে,

সুন্দরবাবুর কাহিনীর ভিতরে আমি তার কোন প্রমাণই পেলুম না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "প্রমাণ পেলে না মানে? তবে এতক্ষণ ধ'রে আমি কার কথা বললুম?'

সুন্দরবাবুর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে জয়ন্ত বললে, "কার কথা বললেন, আমিও তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

—"কার কথা আবার, আমি ঐ মেয়ে-বোম্বেটের কথাই বলেছি।"

—"তাকে কেউ দেখেছে?"

—"না। কিন্তু সবাই তার গলা শুনেছে হুকুম ছায় সে, আর দলের পুরুষরা সেই হুকুম-মত কাজ করে।"

—"বুঝলুম। কিন্তু সকলেই—এমন কি আপনিও শুনেছেন কেবল একটি নারীর কণ্ঠস্বর। সেই নারীকে কেউ কোনদিন দেখেনি, এমন কি তার কোন পূর্ব্ব-ইতিহাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। চোখে না দেখে কেবল কোন কণ্ঠস্বরের ওপরে নির্ভর ক'রে আমি কোন কথাই বলতে চাইনা।"

সুন্দরবাবু বললেন, "শোনা-কথা মাত্রই কি বাজে হয় বাপু?"

—"কোন্ কথা বাজে আর কোন্ কথা কাজের তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। মেয়ে-বোম্বেটের কথা নিয়েও এখন আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি নাড়াচাড়া করছি কেবল ঐ ঘটনাগুলো নিয়ে। বোঝা যাচ্ছে সুন্দরবন অঞ্চলে একদল নৃশংস জলদস্যু

...আবির্ভাব হয়েছে। তারা খালি ডাকাতি ...করে না, যাদের উপরে হানা দেয় তাদের প্রত্যেককেই হত্যা করে। আর সব-চেয়ে ভাববার কথা হচ্ছে, ডাকাতরা নৌকোগুলো পর্য্যন্ত নিয়ে অদৃশ্য হয়।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এর মধ্যে আর ভাববার কথা কি আছে?"

জয়ন্ত বললে, "ভাববার কথা নেই? ডাকাতরা নৌকোগুলো নিয়ে যায় কেন?"

—"কেন আবার, সমস্ত প্রমাণ নষ্ট ক'রে দেবে ব'লে। লুটপাটের পর তারা প্রত্যেক মানুষকে খুন করে ঐ-কারণেই।"

বিমল বললে, "সুন্দরবাবু, আমার মনে হয় এই নৌকোচুরির ভিতরে অন্য-কোন রহস্যও থাকতে পারে।"

—"কি রহস্য, শুনি?"

—"আমার বিশ্বাস, ঐ ডাকাতদের দলপতি এমন-একটা বৃহৎ দল গঠন করছে কিংবা করেছে, যার জন্যে দরকার অনেক নৌকোর।"

জয়ন্ত বললে, "আমিও বিমলবাবুর কথায় সায়-দি।"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, "ও বাবা, হুম্!"

মাণিক বললে, "এ-অনুমান যদি সত্য হয়, তাহ'লে ব্যাপারটা রীতিমত সাংঘাতিক ব'লে মানতে হবে। যে-ডাকাতরা প্রত্যেকমানুষকেই

হত্যা করে, তারা দলে ভারি হ'লে কি আর রক্ষে আছে ?"

জয়ন্ত বললে, "আমিও সেই কথাই ভাবছি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "ভেবেছি তো আমিও অনেক। খালি ভেবে কি লাভ, একটা উপায় তো করতে হবে ?"

জয়ন্ত বললে, "আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে, ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করা।"

সুন্দরবাবু মাথার টাকের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "আরে বাবা, যাত্রা-থিয়েটারের কথা ছেড়ে দাও! যাত্রা তো আমিও করেছিলুম, কিন্তু ফল হ'ল কি ? ঘটে বুদ্ধি আছে ব'লে কোন-গতিকে পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে এ-যাত্রা পালিয়ে আসতে পেরেছি !"

জয়ন্ত বললে, "বোকার মতন কাজ করলেই শাস্তিভোগ করতে হয়।"

—"হুম্, বোকার মতন আবার কি কাজ করলুম ?"

—"আপনি যে চারিদিকে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে করতে গিয়েছিলেন !"

—"মানে ?"

—"প্রকাশ্যে নৌকো-বোঝাই পুলিস-ফৌজ নিয়ে আপনি গিয়েছিলেন ডাকাতদের ধরতে। কাজেই আপনাকে ধরতে চেষ্টা করেছিল, তারাই।"

সুন্দরবাবু অনুতপ্তকণ্ঠে বললেন, "ঠিক

ভাই জয়ন্ত, ঠিক। বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি ও-অঞ্চলে আমাদের যাওয়া উচিত ছিল, ছদ্মবেশে।"

জয়ন্ত বললে, "তা যাননি ব'লেই পুলিসের সাড়া পেয়েই ডাকাতরা প্রথমে জাল গুটিয়ে আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল। তারপর চমৎকার ফাঁদ পেতে তারা চেষ্টা করেছিল পুলিস-বাহিনীকে একেবারে উচ্ছেদ করতে!"

সুন্দরবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "উচ্ছেদ তো তারা করেছেই, হয়তো দলের ভিতরে বেঁচে আছি খালি আমিই একলা। শুনছি আমাদের বড়-সাহেব নাকি আমার উপরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এখনো তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হইনি, কিন্তু কেমন ক'রে যে মুখরক্ষা করব কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। ভাই জয়ন্ত, তুমি একটা সৎপরামর্শ দাও।"

জয়ন্ত বললে, "আমার মত যদি মানেন, তাহ'লে সদলবলে আবার ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করুন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এবারে তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকবে তো?"

—"যদি বলেন, থাকব। আমিও থাকব, মাণিকও থাকবে। বিমলবাবু, মাণিকবাবু, আপনাদের খবর কি? হাতে কোন নতুন এ্যাডভেঞ্চার আছে নাকি?"

বিমল মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "একটাও না, একটাও না। দুনিয়ায় অত্যন্ত

এ্যাড ভেঞ্চারের অভাব হয়েছে, আমি আর কুমার এখন বেকার ব'সে আছি।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "তাহ'লে চলুন না, সকলে মিলে একবার সুন্দরবন ভ্রমণ ক'রে আসি।"

বিমল ও কুমার একসঙ্গেই বললে, "রাজি।"

মাণিক হাসতে হাসতে বললে, "জয়ন্ত, ক্যাংলাদের তুমি জিজ্ঞাসা করছ ভাত খাবে কিনা! নতুন এ্যাড্‌ভেঞ্চারের গন্ধ পেলে বিমলবাবু আর কুমারবাবু যে তখনি মেতে উঠবেন এটা তো জানা কথাই!"

চতুর্থ

বিজনবাবুর প্রমোদ-তরণী

চব্বিশ পরগণার প্রান্তদেশে সমুদ্রের অনেকগুলো বাহু যেখানে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারই কাছাকাছি ম.ঝারি একটি নদী-পথ।

সেই নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে নোঙরে বাঁধা 'লাঞ্চ'। সেখানি হচ্ছে বিখ্যাত জমিদার বিজনবিহারী রায়চৌধুরীর বাষ্পীয় প্রমোদ-তরণী।

জমিদারি থেকে বিজনবাবুর বার্ষিক আয় চারলক্ষ টাকার উপর। তার উপরে আছে তাঁর ব্যাঙ্কের খাতা। বয়সে তিনি যুবক এবং জমিদারির একমাত্র মালিক। তাঁর নাম জানে না বাংলা দেশে এমন লোক খুব কমই আছে, কেননা দীন-দুঃখীদের জন্যে তিনি অর্থব্যয় করেন অকাতরে। তাঁর একটি সখও আছে এবং সেটি হচ্ছে সঙ্গীত-প্রিয়তা। নিয়মিত মাহিনা দিয়ে তিনি অনেক বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীকে রীতিমত লালনপালন করেন।

মাঝে মাঝে তিনি তাঁর বাষ্পীয় প্রমোদ-তরণী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বাংলা দেশের নানা জলপথে। বিশেষ ক'রে সুন্দরবন হচ্ছে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। এখানে তিনি যখন অবসরযাপন করতে যান, তখন তাঁর সঙ্গে থাকে কয়েকজন সঙ্গীতপ্রিয় বন্ধু এবং কয়েকজন বিখ্যাত গায়ক।

সেদিন ছিল, পূর্ণিমার রাত। পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে সুন্দরবনের অসীম শ্যামলতা হয়ে উঠেছে বিচিত্র এবং জ্যোতির্ম্ময়! বাতাসের ছন্দে ছন্দে নদীর দুই তীরের নির্জ্জন অরণ্যের মধ্য থেকে ভেসে আর ভেসে আসছে অশ্রান্ত মর্ম্মর-রাগিণী! এবং সেই রাগিণীর সঙ্গে সুর জুড়ে দিয়েছে উচ্ছ্বসিত তটিনীর অপূর্ব্ব কলতান!

বিজনবাবুর প্রমোদ-তরণীও নিস্তব্ধ হয়ে ছিল না। 'লাঞ্চে'র উপরকার ছাদের উপরে বসেছে বেশ একটি ছোটখাটো সভা। সেখানে গায়করা আছেন আর আছেন বিজনবাবু ও তাঁর বন্ধুগণ। একজন বিখ্যাত গায়ক তখন সন্তবাহারে করছিলেন চমৎকার আলাপ।

এমন সময়ে নদী-পথে উঠল একটা বেসুরো শব্দ। একখানা মোটর-বোট গর্জ্জন করতে করতে এসে থেমে গেল ঠিক প্রমোদ-তরণীর পাশে।

বিজনবাবু 'লাঞ্চে'র ধারেই বসেছিলেন। তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলেন, মোটর-বোটখানার কোন কল বোধহয় বিগ্‌ড়ে গিয়েছে।

মিনিট চার-পাঁচ পরে মোটর-বোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন একটি প্রাচীন ভদ্রলোক। উজ্জ্বল চাঁদের আলোকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল, তাঁর মাথার শ্বেত কেশ এবং মুখের ধব্‌ধবে লম্বা দাড়ি।

ভদ্রলোকের আকারও যে বিশেষ দীর্ঘ সেটাও বেশ বোঝা গেল, কিন্তু বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে তাঁর দেহ।

হঠাৎ জেগে উঠল এক নারী-কণ্ঠস্বর। যেন কোন নারী বললে, "এই 'লাঞ্চে'র মালিক কে?"

বিজনবাবু বিস্মিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছাদের রেলিঙে ঝুঁকে প'ড়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়েও দেখতে পেলেন না কোন নারীকেই!

তরপরই তাঁর বিস্ময় আরো বেড়ে উঠল। কারণ সেই বৃদ্ধ তাঁকে সম্বোধন ক'রেই আবার সেই নারী-কণ্ঠেই বললে, "এই 'লাঞ্চে'র মালিকের সঙ্গে একবার আমার দেখা হবে কি?"

নারী-কণ্ঠে কথা কইছেন ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক!

বিজনবাবু জীবনে কোন পুরুষের গলাতেই এমন মেয়েলি-আওয়াজ শোনেন নি। নিজের হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে তিনি বললেন, "আমিই এই 'লাঞ্চে'র মালিক। আপনি কি বলতে চান, বলুন।"

মোটর-বোটের বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, "নমস্কার মশাই, নমস্কার! আমার বোট অচল হয়ে গিয়েছে। বোটের চালক বলছে, তার 'পেট্রলে'র ভাণ্ডার ফুরিয়ে গিয়েছে। আপনার কাছ থেকে কিছু 'পেট্রল' আশা করতে পারি কি? বড়ই বিপদে পড়েছি মশাই, যদি এই উপকারটি করতে পারেন তাহ'লে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।"

বিজনবাবু বললেন, "আমার 'লাঞ্চে' তো অতিরিক্ত 'পেট্রল' নেই! আপনাকে যে এই বিপদে সাহায্য করতে পারলুম না, এজন্যে বড়ই দুঃখিত হচ্ছি।"

বৃদ্ধ স্তব্ধ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর হতাশ-ভাবে বললেন, "কার মুখ দেখে বেরিয়েছি জানি না, বড়ই বিপদে পড়লুম। বোট হ'ল অচল, সঙ্গে নেই খাবার, আজ সারারাত অনাহারেই কাটাতে হবে দেখছি! আর কাল সকালেই বা এ-বোট চলবে কেমন ক'রে, তাও তো বুঝতে পারছি না!"

বৃদ্ধ আবার যখন বোটের ভিতরে ঢুকতে উদ্যত হলেন বিজনবাবু সেই-সময়ে বললেন, "মশাই, আপনার অতটা চিন্তিত হবার কারণ নেই। বোটখানা আমার 'লাঞ্চে'র পিছনে বেঁধে আজ আপনি অনায়াসেই আমাদের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে পারেন।"

বৃদ্ধ বললেন, "ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ! কিন্তু আমি তো একলা নই, আমার সঙ্গে রয়েছে যে আরো জন-আষ্টেক লোক। তাদের কি ব্যবস্থা করি বলুন দেখি?"

বিজনবাবু সহাস্যে বললেন, "তাঁদের ব্যবস্থা করতেও আমার কষ্ট হবে না। সবাইকে সঙ্গে ক'রে আপনি এখন 'লাঞ্চে'র উপরে এলেই আমি আনন্দিত হব।"

বৃদ্ধের দেহ বোধহয় অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাঁর সঙ্গের লোকেরা তাঁকে সাহায্য না করলে নিশ্চয়ই তিনি বোট ছেড়ে 'লাঞ্চে'র উপরে এসে উঠতে

পারতেন না। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে সদলবলে 'লাঞ্চে'র ছাদের উপরে এসে দাঁড়ালেন। বিজনবাবু দেখলেন, বৃদ্ধের প্রত্যেক সঙ্গীরই দেহ হচ্ছে রীতিমত অসাধারণ। সকলেরই মূর্ত্তি যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুদীর্ঘ এবং সকলেরই হাতে রয়েছে এক-একগাছা ক'রে বড় লাঠি! ঐ-সব বলবান মূর্ত্তির পাশে বৃদ্ধের দেহকে দেখাচ্ছিল এত অসহায় যে, বর্ণনা ক'রে তা বোঝানো যায় না।

বিজনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "আপনার সঙ্গে এত মোটা-মোটা লাঠির সমারোহ কেন?"

বৃদ্ধ সহাস্যে বললেন, "সুন্দরবন জায়গা তো নিরাপদ নয়! কখন্ কি হয় বলা যায় না! সেইজন্যে একটু প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়!"

বিজনবাবু বললেন, "কিন্তু আমার এই 'লাঞ্চে'র উপরে আপনাদের ঐ লাঠিগুলি কোন কাজেই লাগবে না! এখানে হচ্ছে সঙ্গীতচর্চ্চা, যষ্টির সঙ্গে যার কোনই সম্পর্ক নেই!"

হঠাৎ আসরের ভিতর থেকে বিজনবাবুর এক বন্ধু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! চেয়ে দেখ বিজন, চেয়ে দেখ! চারিদিক থেকে ভেসে আসছে কতগুলো নৌকো! খান-চারেক ছিপ্‌ও আছে দেখছি! ব্যাপার কি?"

নোঙর বেঁধে 'লাঞ্চ' যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানকার নদীর দুই তীরেই ছিল এখানে-

ওখানে কতগুলো ছোট-ছোট নালার মত জলপথ। নৌকোগুলো বেরিয়ে আসছে সেই-সব নালার ভিতর থেকেই। বিজনবাবু ভালো ক'রে দেখবার জন্যে আবার 'লাঞ্চে'র ধারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, এমন সময় সেই বৃদ্ধ বললেন, "আপনিই তো বিজনবাবু?"

বিজনবাবু ফিরে বললেন, "আপনি আমার নামও জানেন দেখছি!"

আচম্বিতে বৃদ্ধের চেহারা গেল একেবারে বদলে! যুবকের মতন সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে সেই অদ্ভুত বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ নারী-কণ্ঠে বললেন, "মশায়ের নাম জানি ব'লেই তো 'লাঞ্চে'র উপরে এসে উঠেছি। সকলের পরিচয় না জানলে কি আমাদের চলে? হা হা হা হা!"

কণ্ঠ—নারীর, কিন্তু কী তীব্র সেই অট্টহাস্য!

বিজনবাবু শান্তকণ্ঠেই বললেন, "আপনার কথার মানে বুঝতে পারলুম না।"

বৃদ্ধ বললেন, "মানে বুঝতে আর বেশী দেরি লাগবে না। আপনি সুন্দরবনের মধু-ডাকাতের নাম শুনেছেন কি?"

বিজনবাবু বললেন, "অমন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম আবার শুনিনি? মধু-ডাকাতের অত্যাচারে সুন্দরবনের নদীতে নদীতে আজ ব্যবসায়ীদের নৌকো চলেনা বললেই হয়। মধু খালি অর্থ লুণ্ঠনই করে না, তার কবলে যারা পড়ে তাদের সকলকেই হত্যা করে। সুতরাং

বুঝতেই পারছেন, মধুর ব্যবহারও বিশেষ মধুর নয়!" বলতে বলতে তিনি লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, বৃদ্ধের একটা চোখ হচ্ছে পাথরের চোখ।

সেই এক-চক্ষু বৃদ্ধ খন্‌খনে মেয়ে-গলায় আবার অট্টহাস্য ক'রে উঠে বললেন, "আমিই হচ্ছি সেই মধু-ডাকাত! এখন আমার বক্তব্যটা আপনি দয়া ক'রে শুনবেন কি?"

বিজনবাবু একথা শুনেও কিছুমাত্র বিচলিত হ'লেন না। স্থিরকণ্ঠে বললেন, "তুমি মধু কি বিষ আমি তা জানতে চাইনা, কিন্তু আমার 'লাঞ্চে'র উপরে তোমার আবির্ভাব কেন?"

মধু তার লাঠিটা সশব্দে ঠুকতে ঠুকতে বললে, "আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি। আপনি একজন দানশীল ব্যক্তি আর বাংলা-দেশের একজন প্রসিদ্ধ লোক। আমার নিয়ম হচ্ছে, যাদের ওপরে আমি হানা দি, তাদের সকলকেই করি খুন! কিন্তু আপনাকে আমি খুন করতে চাই না!"

বিজনবাবু বললেন, "আমার উপরে তোমার এতটা অনুগ্রহের কারণ কি?"

—"কারণ আছে বৈকি! আপনাকে আমি এখনি কীটের মতন হত্যা করতে পারি, কিন্তু তা করব না কেন জানেন? ভীমরুলের চাকে খোঁচা না মারাই ভালো!"

—"অর্থাৎ?"

—"আপনার মতন নামজাদা লোককে

আজ যদি আমি পরলোকে পাঠিয়ে দি, তাহ'লে ইহলোকে উঠবে অত্যন্ত অভদ্র-কোলাহল! কিন্তু আপনাকে প্রাণে মারব না কেবল একটি সর্ত্তে!"

—"সর্ত্তটা কি শুনি?"

—"আপনার আর আপনার বন্ধুদের কাছে যা-কিছু টাকাকড়ি আর মূল্যবান জিনিষ আছে, সমস্তই এখনি আমার হাতে ভালো মানুষের মতন সমর্পণ করুন।"

—"তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার যে-কথা সেই কাজ!

আচম্বিতে সেই নির্জ্জন অরণ্যবিহারী-রাত্রির বুক যে বিদীর্ণ হয়ে গেল তীব্র বাঁশীর পর বাঁশীর শব্দে!

মধু-ডাকাত সচমকে ব'লে উঠল, "ও কিসের শব্দ?"

বিজনবাবু প্রশান্তভাবে হাসতে হাসতে বললেন, "মধু-ডাকাত বেজে উঠেছে পুলিসের বাঁশী! চেয়ে দেখ, চারিদিক থেকে ছুটে আসছে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে পুলিসের মোটর-বোটগুলো। আজ তুমি ফাঁদে পা দিয়েছ!"

মধু টপ্ ক'রে তার মোটা লাঠিগাছা মাথার উপরে তুলে বিকৃত নারী-কণ্ঠে কুৎসিত ভয়াবহ গর্জ্জন ক'রে বললে, "তাই নাকি? তাহ'লে আগে তুইই মর্!"

বিজনবাবু দুই পা পিছিয়ে গিয়ে চকিতে পকেটের ভিতর থেকে একটি চক্চকে অটোমেটিক

রিভলভার বার ক'রে বললেন, "মধু, আমিও অপ্রস্তুত হয়ে নেই! পুলিসের অনুরোধে তোমার লীলাখেলা সাঙ্গ করবার জন্যেই আজ আমার এখানে আগমন হয়েছে!"

মধুর একটিমাত্র চক্ষু একবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেই আবার নিবে গেল! সঙ্গে সঙ্গে সে তীরবেগে ছুটে গিয়ে ...লাঞ্চে'র ছাদের উপর থেকে মারলে এক লাফ্!

নদীর জলে ঝপাং ক'রে গুরুদেহ পতনের একটা শব্দ হ'ল। ...নবাবু ছাদের ধারে গিয়ে দেখলেন, মধু গিয়ে উঠল তার নিজের ...র-বোটের ভিতরে এবং তারপরেই চালকের আসনে ব'সে ...খানা চালিয়ে দিলে পূর্ণবেগে!

চারিদিক থেকে যে নৌকো ও ছিপ্‌গুলো 'লাঞ্চে'র দিকে ...তাড়ি এগিয়ে আসছিল, পুলিসের মোটর-বোটগুলো তাদের ...রে গিয়েই পড়ল। তারপরই সেই চন্দ্রপুলকিত আকাশ যেন ...ক হয়ে উঠল উপর-উপরি মনুষ্য-কণ্ঠের চীৎকারে, গর্জ্জনে, ...র্ত্তনাদে এবং ঘন-ঘন বন্দুকের শব্দে!

কিন্তু পুলিসের একখানা মোটর-বোট সেই হাঙ্গামায় যোগ ...লে না, সেখানা দ্রুতবেগে এগিয়ে চ'লে গেল সোজা নদীর ... ধ'রে।

সেই বোটের ভিতরে ব'সে আছে সুন্দরবাবুর সঙ্গে ..., মাণিক, বিমল ও কুমার।

...দরবাবু বললেন, "হুম্! মধু-বেটা

দেখছি আমার সেই মোটর-বোটখানা নিয়েই লম্বা দেবার চেষ্টায় আছে!"

এ-বোটখানা চালাচ্ছিল বিমল স্বয়ং। বোটের গতি যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে, "জয়ন্তবাবু, মধুর বোট 'ষ্টার্ট' পেয়েছে আমাদের আগেই। ওর নাগাল ধরতে পারব কিনা বুঝতে পরছি না।"

জয়ন্ত বললে, "চাঁদের আলোয় কালো রেখার মত মধুর বোটখানা সামনেই দেখা যাচ্ছে। 'স্পীড' আরো বাড়িয়ে দিলে কি ওকে ধরতে পারা যাবে না?"

বিমল বললে, "'স্পীড' যা বাড়িয়ে দিয়েছি তাইই খুব বিপদজনক। কিন্তু তবু মধু আর আমাদের মধ্যে ব্যবধান কমছে ব'লে তো মনে হচ্ছে না।"

নদী এতক্ষণ চলছিল সমান রেখায়। তারপরই খানিক দূরে দেখা গেল একটা বাঁক। মধুর বোটখানা অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বাঁকের কাছে মোড় ফিরে। মিনিট-দেড়েক পরেই পুলিসের বোটখানাও যখন সেই বাঁকের কাছে গিয়ে মোড় ফিরলে তখন সবাই দেখতে পেলে, নদী আবার চ'লে গিয়েছে সরল রেখায় এবং মধুর বোট চাঁদের আলোয় কালো রেখার মত ছুটে চলেছে তেমনি পূর্ণবেগে।

সুন্দরবাবু উত্তেজিতস্বরে বললেন, "বিমলবাবু, আরো 'স্পীড' বাড়ান। মধু-ব্যাটাকে আজ ধরতে হবেই।"

বিমল মাথা নেড়ে বললে, "এ-বোটের

'স্পীড্' আর বাড়াবার উপায় নেই। তবে মনে হচ্ছে, আমরা বোধকরি শেষপর্য্যন্ত মধুর বোটের নাগাল ধ'রতে পারব!"

নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ সেই বন্য-জগতে নদীর দুই পারের বড় বড় বনস্পতিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন সবিস্ময়ে দেখতে লাগল, যন্ত্রযুগের মনুষ্যদের হস্তে চালিত দু'খানা কলের নৌকোর উল্কাগতির লীলা!

কুমার উৎসাহিতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে বললে, "নদী আবার বেঁকে গিয়েছে! কিন্তু বোধ হচ্ছে ঐ বাঁকের কাছে গিয়েই আমরা মধুর বোটখানাকে ধ'রে ফেলতে পারব!"

বিমল প্রাণপণে বোটের যন্ত্র সামলাতে সামলাতে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "মনে তো হচ্ছে পারব! কিন্তু সামনের বোটখানার অবস্থা দেখছ কি?"

সত্যই তাই!

মধুর বোটখানা বাঁকের কাছে গিয়ে মোড় ফিরলে না, বিদ্যুৎ-বেগে সামনের দিকেই সমান এগিয়ে চলল!

জয়ন্ত ত্রস্ত-কণ্ঠে বললে, "কি সর্ব্বনাশ! মধু যে-ভাবে বোট চালাচ্ছে, এখনি যে বিষম দুর্ঘটনা হবার সম্ভাবনা। মধু কি আত্মহত্যা করতে চায়?"

—বলতে বলতে বাঁকের কাছে মোড় না ফিরে মধুর বোটখানা তীব্রবেগে গিয়ে পড়ল নদীর পাড়ের উপরে! ভীষণ একটা শব্দ হ'ল এবং

তারপরেই বোটের ভিতর থেকে লক্‌লক্‌ ক'রে বেরিয়ে পড়ল আরক্ত-অগ্নির সমুজ্জ্বল শিখা!

সুন্দরবাবু বললেন, "মধু-ব্যাটা বোট সামলাতে পারলে না, বোধহয় জ্যান্তো অবস্থায় ওকে আর ধরতে পারব না, শেষপর্য্যন্ত ব্যাটা আমাদের ফাঁকি দিয়েই পালাল!"

বিমল নিজের বোটের গতি ধীরে ধীরে কমিয়ে বাঁকের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। মধুর বোটের উপরে তখনো চলছে অগ্নিদেবে রক্তাক্ত নৃত্য! ... .

... ... কিন্তু সেই অগ্নিময়-বোটের আগুন যখ নেবানো হ'ল, তখন তার ভিতরে কোন দগ্ধ-বিদগ্ধ মানুষের দেহাবশে পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু মাথার টাক চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বললেন, " আশ্চর্য্য! এরি মধ্যে মধুর দেহ কি পুড়ে ছাই হয়ে গেল?"

বিমল তিক্ত-হাসি হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, আমার ম হচ্ছে, মধু আবার বোধহয় আমাদের ফাঁকি দিলে!"

জয়ন্ত বললে, "আমারও তাই বিশ্বাস। মধু বাঁকের আড়ালে গিয়ে বোট থেকে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে! তারপর সাঁৎরে নদীর পা গিয়ে উঠেছে! আমরা বোকার মত যখন এই শূন্য বো পিছনে ছুটে আসছি তখন সে জঙ্গলের কোন নিরা আশ্রয়ের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে! আ আর তাকে আবিষ্কার করা অসম্ভব!"

...র রক্তপাগল

পঞ্চম

অবলাকান্ত

বিজনবাবুর প্রমোদ-তরণী সেই নদীপথেই অচল হয়ে রইল।

কেবল সশব্যস্ত হয়ে উঠল পুলিসের মোটর-বোটগুলো, তারা সুন্দরবনের এ-অঞ্চলের সমস্ত নদী-নালা দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। এইভাবে কেটে গেল কয়েক দিন।

সেদিন প্রমোদ-তরণীর একটি কামরার ভিতরে ব'সে ছিল জয়ন্ত, মাণিক, বিমল ও কুমার। সুন্দরবাবু সেখানে ছিলেন না, তিনি চরের মুখে কি খবর পেয়ে মধু-ডাকাতের খোঁজে মোটর-বোটে চ'ড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

মাঝে কয়দিনের ভিতরে কোন ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। সে-রাত্রে মধু-ডাকাত পালিয়ে গিয়েছিল পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে, তারপর থেকে কেউ তার সন্ধান না পেলেও সুন্দরবনের এই অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের নৌকো আক্রান্ত হচ্ছে প্রায়ই। কিন্তু কারা আক্রমণ করছে এবং আক্রমণকারীরা কোথায় যে অদৃশ্য হচ্ছে তার কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আক্রমণের পদ্ধতি সেই একই রকমের। বোম্বেটেরা অর্থলুণ্ঠন এবং ব্যবসায়ীদের হত্যা ক'রে নৌকো পর্য্যন্ত নিয়ে পলায়ন করছে। সুতরাং এইসব উপদ্রবের মূলে আছে যে মধু-ডাকাতই সেটা বুঝতে কারুরই দেরি লাগল না।

সুন্দরবনের রক্ত

সেদিন প্রমোদ-তরণীর কামরায় ব'সে মাণিক বলছিল, "জয়ন্ত, একটা বিষয় লক্ষ্য করেছ কি?"

—"কি?"

—"যত ডাকাতি হচ্ছে সব চৌদ্দ-পনেরো মাইলের ভিতরে। অথচ দলে দলে পুলিস-কর্ম্মচারী সুন্দরবনের এ-অঞ্চলের বিশ-পঁচিশ মাইল জায়গা জুড়ে কোথাও তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজতে বাকি রাখেনি। এর মধ্যে হয়তো একটা টেনিস বল পড়লেও তারা খুঁজে বার করতে পারত। এখনো দশ-পনেরো মাইলের মধ্যে যেসব ডাকাতি হচ্ছে, সবাই বলছে সে-সব মধু-ডাকাতের কীর্ত্তি! কিন্তু এ-কথা সত্য ব'লে মানি কি ক'রে?"

জয়ন্ত দুই চক্ষু মুদে চুপ্ ক'রে ব'সে রইল, কোন জবাবই দিলে না। মনে হ'ল, যেন সে কোন-একটা বিশেষ কথা নিয়ে নীরবে নাড়াচাড়া করছে। এমন সময়ে সশব্দে সুন্দরবাবুর প্রবেশ।

কামরায় ঢুকেই মাথার টুপিটা খুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মহা বিরক্তিভরে তিনি ব'লে উঠলেন, "হুম্! মোধো-ব্যাটার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না! যত সব বাজে খবর!"

জয়ন্ত হঠাৎ চোখ খুলে চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে ব'সে নিজের রূপোর নস্যদানী বার ক'রে দু'-টিপ্ নস্য গ্রহণ করলে। তারপর হাসতে হাসতে বললে, "বিমলবাবু, সেই 'জেরিণার কণ্ঠহারে'র

...রক্তপাগল

মামলাটা মনে আছে কি? সে-মামলায় আমরা সকলেই তো একসঙ্গে ছিলুম!”

বিমল ব'সে ব'সে একখানা ইংরেজি সচিত্র সাময়িকের পাতা ওল্টাচ্ছিল। জয়ন্তের প্রশ্ন শুনে কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে, “সে তো এই গেল-বছরের ব্যাপার! এত-শীঘ্র ভুলে যাবার তো কোন কারণ নেই।”

—“সেই মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিল, তার কথাও মনে আছে তো?”

বিমল কোন জবাব দেবার আগেই সুন্দরবাবু ব'লে উঠলেন, “ও বাবা, সে-কথা কি ভোলবার? মাত্র একখানা বাড়ীর ভেতরেই সে-ব্যাটা আমাদের সকলকে রীতিমত ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল! আর শেষপর্য্যন্ত আমরা তাকে হাতে-নাতে গ্রেপ্তারও করতে পারিনি!”

কুমার বললে, “আপনারা কি অবলাকান্তের কথা বলছেন?”

বিমল হঠাৎ অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “অবলাকান্ত, অবলাকান্ত! জয়ন্তবাবু, আপনি খুব-একটা মস্ত প্রশ্ন করেছেন!”

সুন্দরবাবু বললেন, “এ আর মস্ত প্রশ্ন কি? অবলাকান্তের মামলা তো অনেকদিন আগেই চুকে গিয়েছে। তাকে নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?”

বিমল বললে, "জয়ন্তবাবু, সেই অবলাকান্ত ! যে প্রথমেই করেছিল আমাকে বন্দী, তারপর আপনাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল গলায় দড়ী দিয়ে ! * আশ্চর্য্য সেই অবলাকান্ত ! অসাধারণ সুদীর্ঘ তার অতি-কৃষ্ণবর্ণ দেহ, মুখের উপরে জেগে থাকে তার একটিমাত্র চক্ষু, কারণ তার অপর চক্ষুটি পাথরে-তৈরি, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড পুরুষালি-চেহারার ভিতর দিয়ে নির্গত হয় একেবারেই মেয়েলি-কণ্ঠস্বর !"

জয়ন্ত বললে, "সেই অবলাকান্ত গঙ্গায় বানের টানে ঝাঁপ দিয়েছিল বটে, কিন্তু অনেক সন্ধান ক'রেও আমরা তার দেহ খুঁজে পাইনি !"

সুন্দরবাবু হঠাৎ তাঁর সেই গুরুভার দেহ নিয়ে একটি বৃহৎ লম্ফত্যাগ ক'রে বললেন, "হুম্ ! এ-সব কথার মানে কি ?"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "মানেটা আপনি নিজে-নিজেই বোঝবার চেষ্টা করুন !"

কুমার বললে, "বিজনবাবুর মুখে শুনলুম, মধু-ডাকাতেরও রং হচ্ছে কালো, আর তার দেহ হচ্ছে সুদীর্ঘ ! তারও একটা চোখ পাথরের আর সেও কথা কয় একেবারে মেয়েলি-গলায় ! মধু-ডাকাতের সঙ্গে অবলাকান্তের চেহারার বিশেষত্ব বড্ড-বেশী মিলে যাচ্ছে !"

---

* আমার প্রণীত 'জেরিণার কণ্ঠহার' দ্রষ্টব্য ।

সুন্দরবাবু চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, "এ একটা আবিষ্কার! মস্তবড় আবিষ্কার! সেদিনকার সেই অবলাকান্তই যে আজ মধু-ডাকাত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, এ-বিষয়ে আমার আর কোনই সন্দেহ নেই! হুম্!"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, মধুই বলুন আর অবলাকান্তই বলুন, তার টিকির খোঁজ পর্য্যন্ত এখনো তো পাওয়া গেল না! আপনারা সুন্দরবনের এ-অঞ্চলের বিশ-পঁচিশ মাইল তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে দেখলেন, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত কিছুই আবিষ্কার করতে পারলেন না! অতএব আমাদের এখন উচিত হচ্ছে, কলকাতায় আবার ফিরে যাওয়া। বুনো-হাঁসের পিছনে কতদিন ধ'রে ছুটব?"

সুন্দরবাবু ধপাস্ ক'রে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে হতাশভাবে বললেন, "কি করব ভাই, এই মধু-ব্যাটা হয়তো ভোজবাজী জানে! সে কাছাকাছিই আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদিও সে এই 'লাঞ্চে'র ত্রিসীমানায় আসে না, তবু নৌকোর পর নৌকোর উপরে হানা দিচ্ছে দশ-পনেরো মাইলের ভিতরেই! সে কাছেই আছে অথচ তাকে দেখা যাচ্ছে না, বোধহয় সে মায়াবী—ফুস্‌মন্ত্র জানে!"

ঠিক এইসময়েই বিজনবাবুর অনুচররা কামরার ভিতরে এসে ঢুকল কয়েকখানা 'ট্রে' ভরে' খাদ্য ও চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। চমৎকৃত হয়ে গেল

যেন সুন্দরবাবুর দেহ ও মুখ! তিনি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, এসেছ বাবা! বড়ই ভালো কাজ করেছ! ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী চোঁ-চোঁ করছে।"

*** ***

***

বিজনবাবুর অতিথি-সৎকার হচ্ছে চমৎকার! এটা হচ্ছে সুন্দরবাবুর নিজস্ব মত। কিন্তু বিমল ও কুমার এবং জয়ন্ত ও মাণিকের মত হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো। তারা বলে, "চমৎকার ব্যাপার যে কতখানি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, আজ এখানে এসেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।"

প্রভাতী-চায়ের আসরে বিশ-তিরিশ-রকম টুকিটাকি খাবার; মধ্যাহ্নের খাদ্য-তালিকায় পাওয়া যাবে অন্তত পঞ্চাশ-রকম খাবারের নাম; বৈকালী-চায়ের আসরে আবার সেই বিশ-তিরিশ-রকম খাবার এবং রাত্রের ভোজের ব্যাপারটা হচ্ছে রীতিমত গুরুতর! একদিন খাদ্য-তালিকায় সেখানে নাম পাওয়া গিয়েছিল, পঁচাত্তর-রকম খাবারের!

কুমার বললে, "বড়-মানুষ দেখাচ্ছেন বড়-মানুষী। কিন্তু খাবারের ঠ্যালায় আমাদের মতন ছোট-মানুষের প্রাণ যে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে! সত্যি জয়ন্তবাবু, বিজনবাবু আমাদের খাদ্য-পর্ব্বতের তলদেশে একেবারে পিষে মেরে ফেলতে চাইছেন! আমার মনে হচ্ছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! কুমারবাবু, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন না! খাবারের ভয়ে কেউ যে পালিয়ে যেতে চায় এমন কথা এই প্রথম শুনলুম! কে জানে বাবা, দুনিয়ায় কত-রকম লোকই আছে!"

মাণিক বললে, "ঠিক বলেছেন সুন্দরবাবু! আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম!"

সুন্দরবাবু কোনদিনই মাণিকের রসনাকে বিশ্বাস করেন না। তিনি সন্দিগ্ধ-স্বরেই বললেন, "কি-রকম, তুমিও ঐ-কথাই ভাবছিলে?"

মাণিক বললে, "হ্যাঁ সুন্দরবাবু। দুনিয়ায় কত-রকম লোকই আছে! কোন মানুষের পক্ষীর আহার, আবার কেউ পেট ভরায় ঠিক গ্লুটনের মতন।"

সুন্দরবাবু দুই ভুরু কুঞ্চিত ক'রে বললেন, "গ্লুটন মানে?"

—"তা জানেন না বুঝি? গ্লুটন নামে এক চতুষ্পাদ জানোয়ার আছে, সে যত পাবে ততই খাবে! এমন কি, যখন খেতে আর পারবে না তখনো সে গোগ্রাসে উদর পূর্ণ করতে চাইবে!"

—"ক্ষিদে মিটে গেলে কেউ আবার খেতে চায় নাকি?"

—"গ্লুটনরা চায়। তাদের পেট যখন খেয়ে খেয়ে ফোলা-ঢাপরের মতন হয়ে উঠেছে, অথচ সামনের খাবার যখন শেষ হয়নি, তখন তারা কি করে জানেন?"

সুন্দরবাবু অধিকতর সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন, "আমি জানি না, আর জানতেও চাইনা!"

—"আহা, তবু শুনে রাখুন না! গ্লুটন্ তখন করে কি, বনের ভিতরে খুঁজে এমন দু'টো বড়-বড় গাছ বেছে নেয় যাদের মধ্যের ফাঁক দিয়ে তার শরীর একেবারেই গলে না। কিন্তু গ্লুটন্ সেই অল্প ফাঁকটুকুর ভিতরেই নিজের শরীর এমন প্রাণপণে গলিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে, দু-দিক থেকে বিষম চাপ পেয়ে তার পেটের খাবার আবার হড়্ হড়্ ক'রে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তারপর পেট যেই খালি হয়ে যায়, তখন সে আবার বাকি-খাবারগুলোকে পাঠিয়ে দেয় জোর-ক'রে খালি-করা পেটের ভিতরে!"

সুন্দরবাবু অত্যন্ত মুখভার ক'রে বললেন, "এখানে হঠাৎ তোমার ঐ গ্লুটনের কথাটা মনে পড়ল কেন বল দেখি?"

মাণিক দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, "মনে পড়ল, তাই বললুম! কেন মনে পড়ল, সে-কথা নেই-বা বললুম!"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "তোমার মতন হাড়-বজ্জাত ছোকরা জীবনে আমি আর কখনো দেখিনি! আমি এত বোকা নই হে, কাকে লক্ষ্য ক'রে তুমি এ-কথা বলছ তা বুঝতে পেরেছি। হুম্!" তিনি রাগে গস্ গস্ করতে করতে উঠে গিয়ে একখানা বড় সোফার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন— নিজের প্রচণ্ড হজম-শক্তির দ্বারা বৃহৎ উদরের বৃহত্তর ভার খানিকটা কমিয়ে ফেলবার জন্যে।

মাণিক আর কুমার দাবাবোড়ে খেলতে

ব'সে গেল। একখানা চেয়ার জানলার দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ব'সে প'ড়ে জয়ন্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, নদীর ঐ তীরে সুন্দরবনের কাঁচা শ্যামলতার উপর দিয়ে ব'য়ে যেতে-যেতে চঞ্চল বাতাস তুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আলো আর ছায়ার হিন্দোলা!

খানিকক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা নেই।

বিমল হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ডাকলে, "জয়ন্তবাবু!"

—"কি বলছেন বিমলবাবু?"

—"আপনি সুন্দরবনের এখানকার প্রাচীন ইতিহাস জানেন?"

—"বিশেষ কিছুই জানি না।"

—"প্রাচীনকালে এখানে একটি মস্ত-বড় রাজ্য ছিল। তখন কেউ তাকে ডাকত—ব্যাঘ্রতটী ব'লে, আর কেউ ডাকত—সমতট ব'লে। এই সমতট-রাজ্য এমন বিখ্যাত ছিল যে, সেকালকার চীন দেশের প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী হুয়ান্ চুয়াঙ্ পর্য্যন্ত এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। সেইসময়ে তিনি এসে দেখেছিলেন, এখানে নানাজাতীয় ধর্ম্মোপাসকরা বাস করেন। তাঁদের কেউ জৈন, কেউ বৌদ্ধ, কেউ হিন্দু। এখানে তিনি তিরিশটি বড় বড় বৌদ্ধ-মঠ আর বিহার দেখেছিলেন, আর দেখেছিলেন হিন্দুদের একশোটি মন্দির। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক সহরে যা যা থাকে এখানেও সে-সমস্তের কোনই অভাব ছিল না—অর্থাৎ নাগরিকদের অসংখ্য ঘর-বাড়ী,

ধনীদের অট্টালিকা, রাজা-রাজড়াদের প্রাসাদ।
কিন্তু সে-সব অতীত ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন এখন
পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "তার কারণ ?"

—"সুন্দরবনের এখানটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত জায়গা। এখানকার মাটি নাকি ক্রমাগত নীচের দিকে ব'সে যায় আর তার উপরে এসে জায়গা জুড়ে থাকে নূতন মাটি। আজ সুন্দরবনের এই অঞ্চলের অনেক জায়গা খনন ক'রে উপরকার মাটির তলায় পাওয়া গিয়েছে বড় বড় প্রাসাদ, অট্টালিকা আর ঘর-বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। আবার অনেক জায়গায় মাটি খুঁড়ে দেখা গিয়েছে, বড় বড় গাছগুলো মাটি চাপা প'ড়েও সোজা হয়ে সারি-সারি দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এসে সন্ধানী-লোক যদি খোঁজ আর চেষ্টা করে, তাহ'লে পৃথিবীর গর্ভ থেকে আবিষ্কার করতে পারে সেকালকার একাধিক ভূপ্রোথিত অট্টালিকা বা মন্দির প্রভৃতি। অবশ্য আবিষ্কার করবার জন্যে কারুকে বিশেষ সন্ধান করতে হয় না, কারণ পৃথিবীর উপরকার মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই অনেক সময় বোঝা যায় যে, লোকের চোখের আড়ালে এখানে লুকিয়ে আছে, অতীতের কোন-না-কোন কীর্ত্তি।"

জয়ন্ত হঠাৎ চেয়ার ঘুরিয়ে ব'সে আগ্রহ-ভরে বললে, "তারপর ?"

—"তারপর ? ভারতে যখন মোগলদের সাম্রাজ্য, বাংলার মহাবীর প্রতাপাদিত্য যখন

স্বাধীনতার তূর্য্যধ্বনি করছেন, তখনো এখানে আবার নূতন ক'রে মানুষের বসতি—অর্থাৎ সহর বা গ্রাম বসাবার চেষ্টা হয়েছিল। তখনো এখানে সুন্দরবনের কেঁদো-বাঘের হুঙ্কারের চেয়ে ঢের-বেশী শোনা যেত নাগরিক মানুষদের মিষ্ট কণ্ঠস্বর। কিন্তু তার পরই এখানে সুরু হয়, পর্ত্তুগীজ-বোম্বেটেদের অমানুষিক অত্যাচার। তারা ডাঙায় নেমে লুট্‌পাট্‌ই করত না, সেইসঙ্গে ধ'রে নিয়ে যেত অগুন্তি মেয়ে, পুরুষ আর বালকদেরও। পাছে সেই বন্দীরা জলদস্যুদের জাহাজ থেকে জলে লাফিয়ে পালিয়ে যায়, সেইজন্যে তাদের অনেককে কি-রকম ক'রে ধ'রে রাখা হ'ত জানেন?"

এতক্ষণে সুন্দরবাবুর প্রায়-ঘুমন্ত আগ্রহ সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। তিনি ধড়্‌মড় ক'রে সোফার উপরে উঠে প'ড়ে বললেন, "বিমলবাবু, আপনার গল্পটি ভারি 'ইণ্টারেষ্টিং' লাগছে!"

—"এ গল্প নয় সুন্দরবাবু, এ-সব হচ্ছে, ইতিহাসের কথা।"

—"মানলুম। কিন্তু ঐ পাজী পর্ত্তুগীজরা বাঙালী বেচারীদের জাহাজের উপরে নিয়ে গিয়ে কি-রকম ক'রে ধ'রে রাখত?"

—"জাহাজের পাটাতনের তলায় যেখানে দশজন লোক ধরেনা সেইখানে ঢুকিয়ে দিত হয়তো একশো'জন বাঙালীকে। তারপর তাদের প্রত্যেকের হাত পেরেক বা হুক্ মেরে জাহাজের কাঠের সঙ্গে সংলগ্ন ক'রে দিত। তাদের বাস করতে হ'ত ঘুট্‌ঘুটে

অন্ধকারে, তাদের কেউ শুতে পেত না—
কারণ পা ছড়াবার মতন ঠাঁই সেখানে থাকতনা।
কিন্তু তাদের বাঁচিয়ে না রাখলে চলবে না, কেননা
দেশ-বিদেশে গোলাম-রূপে তাদের বিক্রি করবার
জন্যেই গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'ত। অতএব
তাদের মাঝে মাঝে কিছু জল আর কিছু কিছু ক'রে
অসিদ্ধ শুকনো চাউল খেতে দেওয়া হ'ত। বুঝতেই পারছেন,
এ-অবস্থায় মানুষ বাঁচতেই পারে না! যাদের নিতান্ত কই-মাছের
প্রাণ, তারাই বেঁচে থাকত কোনগতিকে—অর্থাৎ দুইশতজনের
মধ্যে হয়তো পঁচিশ কি তিরিশটি প্রাণী!"

কুমার ও মাণিক দাবাবোড়ে খেলা ভুলে গিয়ে শিউরে উঠে
একসঙ্গে বললে, "কী ভয়ানক!"

বিমল বললে, "ঐ মহাপাপিষ্ঠ পর্তুগীজ-বোম্বেটেদের
অত্যাচারেই শেষটা সুন্দরবন একেবারেই জনশূন্য হয়ে গেল।
মানুষের বদলে এই দেশে শেষটা বেড়ে উঠতে লাগল, ব্যাঘ্র
আর বন্য জন্তুদের বংশ।"

জয়ন্ত হঠাৎ নিজের আসন ত্যাগ ক'রে উঠে বিমলের সামনে
এসে ব'সে বললে, "বিমলবাবু, আজ হঠাৎ আপনি পুরাতন-
ইতিহাসের কথা তুললেন কেন?"

জয়ন্তের মুখের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিমল
হাসতে হাসতে বললে, "আমি নিজের দেশের
প্রাচীন ইতিহাস ভালোবাসি। আর

অবসর পেলে মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চাও করি। আজ আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জানেন?"

—"বলুন!"

—"আপাতত দেখছি সুন্দরবাবুর হাতে কোনই কাজ নেই। মধুডাকাত অদৃশ্য, তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে দলে দলে পুলিসের চর। মধু দশ-পনেরো মাইলের ভিতরে ডাকাতি করছে, অথচ এখনো তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যদি ইতিমধ্যে মধুর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহ'লে সুন্দরবাবুই তার জন্যে বিজনবাবুর এই 'লাঞ্চে' ব'সে অপেক্ষা করুন। এই ফাঁকে আমি আর কুমার আর আমাদের বাঘা, আর আমাদের রামহরি যদি সুন্দরবনের খানিকটা ঘোরাঘুরি ক'রে দেখি, তাতে আপনাদের কিছু আপত্তি আছে কি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হঠাৎ এই বিপদ-ভরা বনে-জঙ্গলে ছুটোছুটি ক'রে আপনাদের কি লাভ হবে?"

—"লাভ হয়তো কিছুই হবে না। মানুষ বসবার বা দাঁড়াবার বা শুয়ে ঘুমোবার জন্যে ছোটাছুটি করে না। ছোটবার জন্যেই সে ছোটে!"

—"হুম্! ছুটে কোথায় যাবেন?"

—"কোথাও না। থাকব এই সুন্দরবনেই। তবে আমার কৌতূহল যখন জেগেছে তখন ছুটোছুটি ক'রে একবার দেখবার চেষ্টা করব,

সুন্দরবনের রক্তপাগল

এ-অঞ্চলের কোথাও প্রাচীন-কীর্ত্তির কোন চিহ্ন আছে কিনা ?"

—"চিহ্ন মানে ?"

—"চিহ্ন মানে ? আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে যে, এখানকার কাছাকাছি কোন-এক জায়গায় এমন-কোন প্রাচীন বৌদ্ধ-বিহার বা প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে, যা খুঁজে বার করতে পারলে বাংলার অতীতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে উঠবে।"

—"পাগলের কথা ! অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়াবার জন্যে আমি বাঘ বা অজগরের পেটের ভিতরে ঢুকতে রাজি নই !"

জয়ন্তের দুই চক্ষু জ্ব'লে উঠল। সে বললে, "বিমলবাবু, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব !"

মাণিক দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমিও !"

সুন্দরবাবু বললেন, "বাব্বাঃ ! যত পাগলের পাল্লায় এসে পড়েছি ! আমি এক পা-ও নড়ছি না, আমি এইখানেই অচল শিব-লিঙ্গের মতন ব'সে থাকব। 'ডিউটি ইজ ডিউটি' ! হুম্ !"

সুন্দরবনের রক্তপাগল

ষষ্ঠ

অজগরের কুণ্ডলী

সেদিন রাত্রে হঠাৎ এল ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি।

তখন বর্ষাকাল নয় বটে, কিন্তু সুন্দরবনের এ-অঞ্চলটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের একেবারে পাশেই। এখানে সমুদ্রের উদ্দাম ঝোড়ো-হাওয়া কোথা থেকে কখন্‌ যে বিদ্যুতাগ্নি-ভরা জলবর্ষি কালো মেঘকে টেনে আনবে, কেউ তা আন্দাজ করতে পারে না।

প্রায় ঘণ্টা-তিনেক ধ'রে হু-হু ঝোড়ো-বাতাসে এই অরণ্য-জগতের চতুর্দ্দিকে প্রলয়-হাহাকার জাগিয়ে সেই জল-ভরা কালো মেঘ চাঁদকে আবার মুক্তি দিয়ে চ'লে গেল কোথায়!

বিমল ও জয়ন্তের দল পরদিন প্রভাতে যখন ধারালো দৃষ্টি দিয়ে সুন্দরবনের শ্যামল দেহকে ব্যবচ্ছেদ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল, তখনো চারিদিকে থই-থই করছে জল আর জল। যেখানে জল নেই সেখানে কর্দ্দমের রাজত্ব।

মাণিক বললে, "বিমলবাবু, অন্তত আজ আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। দেবতা আমাদের ওপরে বিরূপ। বরুণদেবের অভিশাপে পথ আর বিপথ এত-বেশী দুর্গম হয়ে উঠেছে যে, আজ আমাদের অভিযান হয়তো একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে!"

বিমল হেসে বললে, "আমার ঘর-পালানো মন যখন অজানা পথের ডাক শুনতে পায়,

তখন দেবতা বা দানব কারুর বাধাই আমি মানি না !”

জয়ন্ত বললে, “আমারও মন আজ প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আপনার মনেরই সঙ্গী হবে। ইচ্ছা প্রবল হ'লে জল-কাদা-জঙ্গল মানুষকে কোন বাধাই দিতে পারে না !”

পিছন থেকে রামহরি গজ-গজ করতে করতে বললে, “মাণিকবাবু ঠিক কথাই বলেছেন ! কিন্তু এই জয়ন্তবাবুটি দেখছি আমাদের খোকাবাবুরই মতন মাথা-পাগ্‌লা। এক পাগ্‌লাকেই সামলাতে পারি না, আজ ডবল্‌-পাগ্‌লাকে নিয়ে হাড় জ্বালাতে হবে দেখছি ! কিগো কুমারবাবু, তোমার ইচ্ছেটা কি শুনি ?”

কুমার হাসতে হাসতে বললে, “রামহরি, তুমি কি জানো যে, বিমলের ইচ্ছা আর আমার ইচ্ছা এক ?”

রামহরি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, “তা জানিনা আবার ! তবু কথার কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম। কিন্তু বাঘা-বেচারীকে এখানে মিছিমিছি টেনে এনে কি লাভ হ'ল ? হ্যাঁরে বাঘা, এই বিচ্ছিরি জল-কাদা-জঙ্গল তোর কি ভালো লাগবে ?”

বাঘা যেন রামহরির কথার প্রতিবাদ করবার জন্যেই বিপুল পুলকে ঘন-ঘন লাঙ্গুল আন্দোলন করতে করতে ঠিক পাশে একটি ছোট্ট নালার জলে ঝম্প প্রদান ক'রে সচীৎকারে ব'লে উঠল, “ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ !”

রামহরি রেগে টং হয়ে বললে, “যেমন মনি

...তেমনি কুকুর! নাঃ, এখানে আর আমার ...কোন কথা কওয়াই উচিত নয়!"

তারপর আরম্ভ হ'ল যাত্রা! আর সে কী যাত্রা! পদে পদে সে কী বাধা! কোথাও কোমর-ভোর ঘোলা জল, কোথাও হাঁটু-ভোর পুরু কাদা, কোথাও সূর্য্যালোকে সমুজ্জ্বল দিবসেও অমাবস্যার রাত্রির মতন অন্ধকার-জঙ্গলের অন্তঃপুর, কোথাও কাঁটাঝোপের পর কাঁটাঝোপের সুতীক্ষ্ণ দংশন!

তবু তারা অগ্রসর হয়েছে! তারা জলাভূমি মানলে না, জঙ্গলের যত অদৃশ্য বিভীষিকাকে মানলে না, মনুষ্য-পদচিহ্নহীন অপথ, বিপথ বা কুপথ কিছুই মানলে না! তারা সঙ্গে ক'রে এনেছিল তিনখানা ছোট-ছোট অতিশয় হাল্কা রবারের নৌকো, স্থলপথ শেষ হয়ে গিয়ে যেখানে আসে জলপথের পর জলপথ, সেই নৌকোর উপরে আরোহণ ক'রে তারা এই নদী-বহুল সুন্দরবনের বাধাকে সরিয়ে দেয়।

একাধিক বিষাক্ত সাপেরও দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু তারা রাতরাত্রের ঝড়-বৃষ্টিতে এমন অসহায় হয়ে পড়েছে যে, ঘৃণ্য মানুষদের দেখেও কোন-রকম আক্রমণ এমন কি পালাবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করলে না। কোন কোন জলপথে দু-চারটে কুমীরের প্রলুব্ধ মুখও দেখা গেল, কিন্তু দলের কারুর-না-কারুর বন্দুকের আওয়াজ শুনেই আবার তারা তলিয়ে গেল অতল তলে!

কিন্তু তাদের সব-চেয়ে জ্বালাতন করছিল সুন্দরবনবিহারী অসুন্দর মশকের দল। তারা স্থলে বা জলে যেখান দিয়েই যাচ্ছে, সেইখানেই ঐ মশকেরা হ'তে চাচ্ছে যেন তাদের সহযাত্রী! আর কী যাতনাদায়ক সহযাত্রী তারা! মশক-রাজ্যের জাতীয়-সঙ্গীত গাইতে গাইতে নিষ্ঠুর আনন্দে তারা বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতির দেহের অনাবৃত অংশের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল এবং সঙ্গে-সঙ্গে সকলের দেহকে ক'রে তুললে স্ফীত, রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত!

এমন কি, বাঘা পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠল! তার রোমশ-দেহও সুন্দরবনের মশাদের হুলগুলোকে ঠেকাতে পারলে না! সে বারংবার ঊর্দ্ধমুখে লম্ফত্যাগ ক'রে এক-এক গ্রাসে দলে দলে মশককে গলাধকরণ করলে বটে, কিন্তু তবু এই ভয়াবহ পতঙ্গদের অত্যাচার কিছুমাত্র কমল ব'লে মনে হ'ল না!

সকাল থেকে বৈকাল পর্য্যন্ত এইভাবে পথ আর বিপথের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। কিন্তু প্রায় মাইল-পনেরো ঘোরাঘুরি ক'রেও তারা এই অরণ্য-জগতের ভিতর থেকে সেকালকার মানুষের হাতে-গড়া একখানা পুরাতন ইষ্টক পর্য্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলে না। এখানে পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে সাড়া দিচ্ছে খালি গাছে-গাছে বানর ও নানা-জাতের পাখীরা। সুন্দরবন যে-সব হিংস্র ও চতুষ্পদ জীবের জন্যে বিখ্যাত, তাদেরও কোন সাড়াশব্দ

পাওয়া গেল না। বোধহয় গত-রাত্রের ঝড়-বৃষ্টির তাল সামলাতে সামলাতে তারাও আজ বিব্রত হয়ে আছে।

বৈকাল যখন কেটে গেল তারা উদরের অতি-জাগ্রত অগ্নিদেবকে তুষ্ট করবার জন্যে এক-জায়গায় ব'সে পড়তে বাধ্য হ'ল। সঙ্গে ছিল 'স্যাণ্ডউইচ', সিদ্ধ ডিম্ব, মর্ত্তমান কদলী আর 'ফ্লাস্ক'-ভরা গরম চা!

আহার-পর্ব্ব যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, জয়ন্ত হঠাৎ সচমকে ব'লে উঠল, "একি ব্যাপার বিমলবাবু?"

—"কি?"

—"নীচের দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

বিমল কর্দ্দমাক্ত-পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নির্ব্বাক হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্যে। তারপরে বিস্মিতস্বরে বললে, "এযে দেখছি নতুন মানুষের পায়ের দাগ! এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই গভীর অরণ্যে একজন মানুষকেও দেখতে পেলুম না, কিন্তু এখানে এই পায়ের দাগ এল কেমন ক'রে? এ-পায়ের দাগ তো পুরানো নয়! কাল রাতে উচ্ছল-ধারায় যে বৃষ্টি হয়ে গেছে, মাটির উপরকার যে-কোন পুরানো পায়ের দাগ তাতে বিলুপ্ত না হয়ে পারে না। এ হচ্ছে এমন-কোন মানুষের পায়ের দাগ, যে একটু আগেই এখানে ছিল বিরাজমান!"

জয়ন্ত বললে, "এ-পায়ের দাগ যে আমাদের নয়, সে-কথা বলাই বাহুল্য। কারণ আমাদের

সকলেরই পায়ে আছে জুতো, আর এই পদচিহ্নের অধিকারী এখানে এসেছে পাদুকাহীন শ্রীচরণ নিয়ে! সে যে আমাদের পরে এসেছে, এ-বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। কারণ, প্রায় সব-জায়গাতেই তার পায়ের ছাপ পড়েছে আমাদের পদচিহ্নের উপরেই। কে সে?"

কুমার দু-চারবার এদিকে-ওদিকে ঘুরে বললে, "এই নগ্নপদের মালিক ঢুকেছে পাশের ঐ বনের ভিতরে। কারণ, পদচিহ্নগুলো হঠাৎ বেঁকে ঐ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।"

ইতিমধ্যে বাঘা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সচেতন! সে যেন সকলকার কথা বুঝতে পারলে! এতক্ষণ সে থেবড়ি খেয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ব'সেছিল এই বৈকালী-ভোজের 'স্যাণ্ডউইচ্' বা সিদ্ধ ডিমের দু-এক টুকরো লাভ করবার জন্যে। কিন্তু এখন হঠাৎ এই নূতন পদচিহ্নের আঘ্রাণ নিয়ে দুই কাণ খাড়া ক'রে গর্‌র্ গর্‌র্ চাপা গর্জ্জন ক'রে উঠল! তারপর অতি-লোভনীয় 'স্যাণ্ডউইচ্' প্রভৃতির কথা একেবারে ভুলে গিয়ে সেই নগ্নপদের চিহ্ন শুঁকতে শুঁকতে ঢুকে গেল পাশের একটা অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে!

কুমারও ছুটল তার পিছনে পিছনে। এবং দলের বাকি সকলেই বিনাবাক্যব্যয়ে বাধ্য হ'ল তারই পশ্চাৎ অনুসরণ করতে।

কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে কারুকেই পাওয়া

গেল না। সেখানে পদচিহ্ন দেখেও অগ্রসর হবার উপায় নেই, কারণ, মাটির উপরটা আচ্ছন্ন ক'রে আছে সুদীর্ঘ আগাছার দল।

সকলে আবার জঙ্গলের বাইরে এসে দাঁড়াল।

জয়ন্ত বললে, "ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই বনের ভিতরে চোখের সামনে আমরা কোন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আমাদের পিছনে পিছনে নিশ্চয়ই এসেছে কোন লোক। নিশ্চয়ই সে আমাদের গতিবিধির ওপরে লক্ষ্য রাখছিল, কিন্তু হঠাৎ আমরা বৈকালী-ভোজের জন্যে এইখানে ব'সে পড়েছি দেখে, ধরা পড়বার ভয়ে পাশের জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!"

বিমল বললে, "কিন্তু মাটির উপরে তাকে পা ফেলে আসতে হয়েছে। সে যে কোথা থেকে এসেছে এই মাটির উপরেই তার চিহ্ন লেখা আছে! তাকে যখন পেলুম না তখন দেখা যাক্, সে আমাদের পিছনে পিছনে এসেছে কোন্ অন্তরাল থেকে!"

জয়ন্ত আগেই দাঁড়িয়ে উঠেছিল। সে বললে, "বিমলবাবু, ঠিক বলেছেন। আসুন, এইবার সেই চেষ্টাই করা যাক্!"

মাণিক বললে, "আমরা এসেছিলুম সুন্দরবনের ভিতর থেকে কোন পুরাকীর্ত্তির সন্ধান করতে। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে এখন গোয়েন্দা-কাহিনীর মতন!"

জয়ন্ত বিরক্তকণ্ঠে বললে, "মাণিক, তুমি মূর্খের মতন কথা কোয়ো না!"

—"আমি কি মূর্খের মতন কথা কয়েছি? তাহ'লে ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

—"ছিঃ! মাণিক, এতকাল আমার সঙ্গে থেকেও তুমি যে এমন বোকার মত কথা কইবে, তা আমি জানতুম না! বোঝাবুঝির কথা হবে পরে, এখন আগে দেখতে হবে এই নগ্নপদের চিহ্নগুলো এসেছে কোথা থেকে!"

সকলে আবার ফিরতি-পথে অগ্রসর হ'ল। পুরু কাদার উপরে পায়ের চিহ্নগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। সকলে তাই দেখে এগুতে-এগুতে প্রায় দেড়-মাইল পথ পার হয়ে গেল। তারপরই দেখা গেল পদচিহ্নগুলো প্রবেশ করেছে এমন-এক প্রচণ্ড অরণ্যের মধ্যে, যেখানে কোন জীবের পক্ষে যাতায়াত করবার কল্পনা করাও অসম্ভব!

কী অন্ধকার অরণ্য! সূর্য্যের আলোক এখনো নির্ব্বাপিত হয়ে যায়নি, কিন্তু সে-অরণ্যের মধ্যে দৃষ্টিচালনা করতে গেলেও চক্ষু যেন নিরন্ধ্র-অন্ধকারের নিরেট প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে পালিয়ে আসতে চায়! তবু সকলেই টর্চ্চের আলো জ্বেলে সেই নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলে।

আশ্চর্য্য ব্যাপার! অমন যে দুর্গম বন-জঙ্গল, তার ভিতরেও গাছপালা ও কাঁটা-ঝোপ কেটে কারা যেন পথ তৈরি ক'রে নিয়েছে! সুদীর্ঘ তৃণ ও আগাছা-ঢাকা মাটির উপরে আর কারুর পদচিহ্ন দেখা যায়না বটে, কিন্তু ভুল হবার কোনই উপায় নেই।

কারণ এই গভীর অরণ্যের বাধাকে সরিয়ে দিয়ে একটা সংকীর্ণ পথের রেখা বরাবরই চ'লে গিয়েছে সামনের দিকে! সে-পথের এ-পাশে অন্ধকার, ও-পাশে অন্ধকার, তার উপরদিকেও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার! সকলের মনে হ'ল, এই তিমিরাবগুণ্ঠিত অদ্ভুত পথ দিয়ে অগ্রসর হ'লে একটু পরেই যেন প্রবেশ করা যাবে, রহস্যময় অন্ধকারের নিজস্ব অন্তঃপুরের মধ্যে!

কিন্তু হঠাৎ শেষ হয়ে গেল পথ। পাওয়া গেল একটি ছোট ময়দানের মতন জায়গা। সেখানে মাথার উপরকার আকাশে তখনো জেগে আছে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আলোক-আশীর্ব্বাদ!

আচম্বিতে সেই মহা নির্জ্জন ও মহা নিস্তব্ধ অরণ্য-ভূমির গভীর নিদ্রা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল যেন উপর্য্যুপরি ভীষণ দুই শব্দে!

—গুড়ুম! গুড়ুম!

গর্জ্জন ক'রে উঠেছে রামহরির বন্দুক! সঙ্গে-সঙ্গে রামহরির এক প্রচণ্ড পদাঘাত খেয়ে বিমল পাঁচ-ছয় হাত দূরে ঠিক্‌রে গিয়ে পড়ল!

ততক্ষণে আর সকলেই সচেতন হয়ে সভয়ে দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! রামহরি তাড়িতাড়ি ছুটে গিয়ে বিমলের হাত ধ'রে টেনে তুলে কাতরকণ্ঠে বললে, "খোকাবাবু, তোমাকে আমি লাথি মেরে যে পাপ করেছি, ভগবান আমাকে তার জন্যে ক্ষমা করুন! ঐ গাছটার ওপর থেকে মস্ত-বড় একটা অজগর তোমার ওপরে

ঝাঁপ খেতে আসছিল। বন্দুকের দুই গুলিতে আমি তার মাথা গুঁড়ো ক'রে দিয়েছি! অজগরটা ছট্‌ফট্ করতে করতে ঐ বড় ঝোপটার ভিতরে গিয়ে পড়েছে।"

তখন সেই ঝোপ্‌টাও হয়ে উঠেছে আশ্চর্য্যরূপে জীবন্ত! তার অনেক গাছ-আগাছা তীব্র বেগে ছিট্‌কে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—যেন তার মধ্যে অভিনীত হচ্ছে এক ভয়াবহ বিরাটের নাটকীয় লীলা!

বাঘা মহা ক্রোধে গর্জ্জন ক'রে ছুটে যাচ্ছিল সেইদিকে! কুমার একলাফে তার উপরে গিয়ে প'ড়ে তাকে দুই-হাতে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "ওরে বাঘা, তুই কি জানিস্ না, অজগরের মৃত্যু-যন্ত্রণা? তার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেলেও তার সর্ব্বাঙ্গ কুণ্ডলিত হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে? সেই মৃত-অজগরের জীবন্ত দেহের কুণ্ডলের ভিতরে গিয়ে পড়লে যে-কোন গণ্ডার বা হাতী পর্য্যন্ত পরলোকে যাত্রা করতে পারে?"

ইতিমধ্যে বিমল সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রামহরির একটা কথাও আমলে না এনে চীৎকার ক'রে সে বললে, "কোন কথা না ব'লে সবাই এখান থেকে পালিয়ে এস! চল, আমরা ও-পাশের ঐ ঝোপ্‌টার ভিতরে গিয়ে ঢুকি।"

একটা অতি-অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে সবাই যখন আত্মগোপন করলে মাণিক তখন সুধোলে, "বিমলবাবু, অজগরের মাথা 'তো গুঁড়ো

হয়ে গিয়েছে, সে তো আমাদের আর তেড়ে এসে আক্রমণ করতে পারত না? তবে তাড়াতাড়ি আমাদের এখানে পালিয়ে আসতে বললেন কার ভয়ে?"

জয়ন্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "মাণিক, তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাব ব'লে মনে হচ্ছে! তুমি কি এটুকু বুঝতে পারছ না যে, আমরা এক পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতরে এসে ঢুকেছি, মানুষের হাতে-কাটা এক অভাবিত পথ দিয়ে? নিশ্চয়ই আমরা এসে পড়েছি শত্রুপুরীতে। এখান থেকেই কোন চর গিয়েছিল আমাদের পিছনে-পিছনে! চর যারা পাঠিয়েছিল তারা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে নেই! যদিও বা ঘুমিয়ে থাকত, দু-দু'বার বন্দুকের গর্জ্জনে ভেঙে গিয়েছে তাদের ঘুম! এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে কোনদিন কোন মানুষ আসে না; অথচ এখানে বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠল দু-দু'বার! বন্দুকের গর্জ্জন জানায় মানুষের অস্তিত্ব! তুমি কি মনে করছ যারা আমাদের পিছনে চর পাঠিয়েছিল তারা এখনো অন্ধকার থেকে আলোকে এসে হাজির হয় নি? তারা অজগরেরও চেয়ে ভয়ানক! বিমলবাবু ঐজন্যেই বলছিলেন তোমাদের লুকিয়ে পড়তে!"

কুমার বললে, "জয়ন্তবাবু, আমি আপনাদের সব-শেষে এই জঙ্গলে এসে ঢুকেছি। কিন্তু ঢোকবার আগেই কি দেখলুম জানেন? ডানদিকে খানিক দূরে জেগে আছে একটা পাহাড়—পাহাড়ই বা

বলি কেন, খুব-উঁচু ঢিপির মতন একটা জায়গা, আর তারই তলা থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা মানুষ! বোধহয় একটা নয়, তারও পিছনে পিছনে যেন দেখলুম আরো দু-চারটে মাথা!"

হঠাৎ মানিক বললে, "চুপ্! জঙ্গলের বাইরে যেন কাদের গলা পাওয়া যাচ্ছে।"

দু-তিনজন লোকের অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা গেল বটে!

কিন্তু তার পরেই জাগ্রত হয়ে উঠল এক ভয়ঙ্কর, বীভৎস আর্ত্তনাদ! রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল!

বিমল বললে, "জয়ন্তবাবু, কিছু বুঝতে পারছেন কি? অভাবিতরূপে এখানে বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠল কেন তাই জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে কেউ-কেউ ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে! তারপর একটা জঙ্গল ঘন-ঘন আন্দোলিত হ'চ্ছে দেখে তারা ঢুকেছিল ঐ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে। তার ভিতরে পাক্সাট্ খাচ্ছিল মৃত অজগরের দেখ্‌তে-জীবন্ত সুদীর্ঘ দেহ! তারই দেহের পাকের ভিতরে গিয়ে প'ড়ে কোন নির্ব্বোধ হতভাগ্যকে এখন ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে!"

সেই জঙ্গলের বাইরে দূর থেকে শোনা গেল অনেকগুলো মানুষের কণ্ঠস্বর। তারা যে কি বলছে তা বোঝা গেল না বটে, কিন্তু তারা যে উপকারী বন্ধু নয় এইটুকু বুঝে বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি

একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইল। পাছে বাঘা পশু-বুদ্ধির উত্তেজনায় আচম্‌কা চীৎকার ক'রে ওঠে, সেই ভয়ে কুমার দুই হাত দিয়ে তার মুখ ভালো ক'রে চেপে রইল।

সকলে অপেক্ষা করতে লাগল রুদ্ধশ্বাসে। যেন কোন বিপদ এখনি এসে পড়বে তাদের স্কন্ধের উপরে।

কিন্তু তাদের সৌভাগ্যক্রমে কোন বিপদেরই সূচনা হ'ল না। বাইরের কণ্ঠস্বরগুলো নীরব হ'য়ে গেল ধীরে ধীরে। তারপরে জাগ্রত হয়ে রইল সুধু সুন্দরবনের বনস্পতিদের অনন্ত মর্ম্মর ভাষা এবং চন্দ্রপুলকিত রজনীর ঝর-ঝর জ্যোৎস্না-ধারা।

সপ্তম

কেউটের জঙ্গলে

জয়ন্ত হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে খুব ধীরে ধীরে বাইরের দিকে এগিয়ে এল। তারপর একটা ঝোপ্ একটু ফাঁক্ ক'রে মুখ বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বললে, "কোনদিকে কেউ নেই। একটু আগে এখানে যে একটা মস্ত-বড় ট্রাজেডি হয়ে গেছে, সেটাও আর বোঝবার উপায় নেই। কেবল অজগর সাপের জঙ্গলটা এখনো তেমনি ছট্‌ফটিয়ে দুলে দুলে উঠছে।"

রামহরি বললে, "ও বাবা, তাহ'লে মরাকেও ভয় করতে হয়!"

মাণিক বললে, "জয়ন্ত আর আমি যখন কাম্বোডিয়ায় ওঙ্কারধামের জঙ্গলে গিয়েছিলুম, তখনও এর চেয়ে দু-গুণ বড় একটা ভয়ঙ্কর অজগর আমাদের আক্রমণ করেছিল। সেই অজগরটা মরবার চব্বিশ ঘণ্টা পরেও পাক্‌সাট্ খেতে ছাড়েনি!" *

হঠাৎ পিছন থেকে ফোঁস ক'রে একটা তীব্র গর্জ্জন শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে চম্‌কে বিদ্যুৎ-বেগে পিছন ফিরে সকলেই ত্রস্ত-নেত্রে দেখলে, কুমার ছিট্‌কে একদিকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটির উপরে আছড়ে পড়ল এবং বাঘা প্রচণ্ড এক লাফ্ মেরে আক্রমণ করলে প্রকাণ্ড একটা

* আমার "পদ্মরাগ বুদ্ধ" দ্রষ্টব্য।

সুন্দরবনের রক্তপাগল

কেউটে সাপকে ! এ সাপুড়েদের রুগ্ন, কৃশ, প্রায়-অনাহারী পোষ-মানা সাপ নয়, এ হচ্ছে একেবারে স্বাধীন সর্প ! লম্বায় প্রায় সাত-আট হাত আর তার দেহের বেড়ও প্রায় আট-দশ ইঞ্চি !

বাঘা অত্যন্ত জোয়ান ও বৃহৎ কুকুর। সে একেবারে গিয়ে কেউটেটার গলা কামড়ে ধ'রেছিল বটে, কিন্তু সাপটা ঠিক অজগরের মতই বাঘার সর্ব্বাঙ্গকে নিজের দেহের পাক্ দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলে যে, সে-বেচারী দেখতে দেখতে সাপের গলা কামড়ে ধ'রেই মাটির উপর শুয়ে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল ! দেখেই বোঝা গেল, কেউটে মরলেও বাঘার বাঁচবার কোন উপায়ই নেই !

কুমার পাগলের মত মাটির উপর থেকে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সর্পের মারাত্মক আলিঙ্গনে বদ্ধ তার প্রিয়তম বাঘার দেহের উপরে। তারপর অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একখানা বৃহৎ ছুরি বার ক'রে সাপটার দেহকে নানা জায়গায় আঘাত ক'রে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে দিলে !

রামহরি ব'লে উঠল, "খবরদার বাঘা, সাপটার মুণ্ড এখনো ছাড়িস্ নে ! শুনেছি কেউটেদের কাটা মুণ্ডও লাফ্ মেরে মানুষদের কামড়ে দেয় !"

বাঘা মানুষ-রামহরির ভাষা হয়তো বুঝলে না, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর জীবদের যে সহজাত বুদ্ধি থাকে বাঘার ঘটে সেটুকুর অভাব ছিল না।

কুমার যখন কেউটের দেহের পাক্ কেটে তাকে মুক্তিদান করলে, তখনো সে সাপের মুণ্ডটাকে ত্যাগ করতে রাজি হ'ল না। এবং সত্য-সত্যই সেই দেহহীন মুণ্ডটা তখনো তাকে দংশন করবার চেষ্টা করছিল!

কুমার আবার তার সেই সুদীর্ঘ ও তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে সাপটার মুণ্ডটাকে কুচিকুচি ক'রে প্রায় আট-দশ খণ্ডে বিভক্ত ক'রে দিলে। বাঘা তখন সর্প-মুণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ ক'রে থেব্ড়ি খেয়ে ব'সে রক্তাক্ত জিহ্বা বার ক'রে হা-হা ক'রে হাঁপাতে লাগল।

মাণিক ত্রস্তকণ্ঠে বললে, "বাবা, কেউটে আবার এত বড় হয়! এযে প্রায় একটা ময়াল সাপ!"

জয়ন্ত বললে, "বাঘা দেখছি অদ্ভুত এক সাহসী কুকুর। ও না থাকলে আজ বোধহয় কেউটের বিষে আমাদের দু-তিনজনকে মরতেই হ'ত!"

রামহরি বাঘাকে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে বললে, "খোকাবাবু, এ সর্ব্বনেশে জঙ্গলের ভিতরে আর থাকা নয়! তাড়াতাড়ি খোলা-জায়গায় বেরিয়ে পড়ি চল।"

বিমল বললে, "আমারও সেই মত। অজগর এলেন, কেউটে এলেন, অতঃপর আবার কে আসবেন কিছুই বলা যায় না! মানুষ-শত্রুকে আমি ভয় করি না, কিন্তু এই বুকে-হাঁটা হিল্‌বিলে জীবদের

কাছ থেকে যত তফাতে থাকা যায়, ততই ভালো!"

সকলে একে একে জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

কুমার একদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে বললে, "জয়ন্তবাবু, ঐ দেখুন সেই মস্ত-বড় মাটির স্তূপটা! ওটা বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু! প্রায় ছোট-খাটো একটা পাহাড় বললেই চলে!"

জয়ন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "এমন সমতল জমির উপরে হঠাৎ অত-বড় একটা মাটির স্তূপের সৃষ্টি হ'ল কেমন ক'রে?"

বিমল বললে, "এ-রকম মাটির স্তূপ সুন্দরবনের আরো কোন-কোন জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। আপনি কি 'ভরত-ভায়নার' স্তূপের নাম শোনেন নি?"

—"না।"

—"ঐ 'ভরত-ভায়নার' স্তূপ এ-অঞ্চলে খুবই বিখ্যাত। এখনো তা খনন করা হয়নি বটে, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের বিশ্বাস, ওখানে খনন করলে প্রাচীন বৌদ্ধ-যুগের কোন সৌধ বা বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে!"

কুমার বললে, "জঙ্গলের ভিতরে ঢোকবার আগে দূর থেকে আমি ওখানেই দেখেছিলুম, যেন মাটি খুঁড়েই উঠে আসছে মনুষ্য-মূর্ত্তি!"

বিমল উৎসাহিতকণ্ঠে বললে, "জয়ন্তবাবু,
এতক্ষণ ধ'রে যা খুঁজছিলুম, এইবারে
বোধহয় তারই সন্ধান পাওয়া গেল!"

মাণিক বললে, "আমরা তো দেখতে এসেছি
এখানে কোন পুরাকীর্ত্তি-চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা।"

বিমল বললে, "সে-কথা সত্য। কিন্তু আমরা এখানে
প্রত্নতত্ত্ববিদের কর্ত্তব্য পালন করতে আসিনি। আমাদের এই
অনুসন্ধানের আসল উদ্দেশ্য কি জানেন মাণিকবাবু?"

জয়ন্ত বললে, "আমি জানি। আমি প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আলোচন
করবার সুযোগ পাইনি, তাই এ-অঞ্চলের অরণ্য-রাজ্যের মধ্যে
প্রাচীন প্রাসাদ, মঠ আর বৌদ্ধ-বিহার প্রভৃতির অস্তিত্ব আছে
এটা আমার একেবারেই অজানা ছিল। বিজনবাবুর 'লাঞ্চে' ব'সে
প্রায়ই শুনছিলুম, মধু-ডাকাতের দল মাত্র দশ-পনেরো মাইলে
ভিতরে ডাকাতি ক'রে সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দলে দলে
পুলিসের লোক এই দশ-পনেরো মাইল জায়গা জুড়ে তন্ন-তন্ন ক'রে
খুঁজে দেখেছে, তবু এত-বড় একটা ডাকাতের দলের কোন
পাত্তা পাওয়া যায় না! যারা দশ-পনেরো মাইলের ভিতরে
বাস করে, এত চেষ্টাতেও তাদের আস্তানা খুঁজে পাওয়া
যায় না কেন? রোজ আমি ব'সে ব'সে কেবল এই
কথাটাই ভাবতুম। তারপর বিমলবাবুর কথা শুনে
আমি যেন পেলুম একটা মস্তসম্ভাবনার ইঙ্গিত
তিনি বললেন, 'সুন্দরবনের মাটি নাকি

সুন্দরবনের রক্তপাগল

যুগে যুগে ক্রমাগতই নীচের দিকে অবনত হয়ে যাচ্ছে, আর সেই মাটি ফুঁড়ে মাঝে-মাঝে পাওয়া যাচ্ছে সেকালকার ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ।' তৎক্ষণাৎ আমার মন সচকিতে জেগে উঠল। ভাবলুম, মধু কি তাহ'লে দল-বল নিয়ে এই-রকম চোখের আড়ালে অদৃশ্য কোন ধ্বংসাবশেষের ভিতরে গিয়ে আত্মগোপন করে? আরো আন্দাজ করলুম, খুব সম্ভব বিমলবাবুর মনেও জেগেছে সেই-রকম কোন সন্দেহ! তাই তিনি যখন নতুন-কোন পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কারের অছিলায় সুন্দরবনের এ-অঞ্চলটায় বেড়াবার জন্যে বেরিয়ে পড়তে চাইলেন, আমি তখনি সাগ্রহে তাঁর প্রস্তাবে সায় দিলুম। কেমন বিমলবাবু, কথাটা কি ঠিক নয়?"

বিমল কোন জবাব দিলে না, মুখ টিপে-টিপে কেবল হাসতে লাগল।

কুমার অধীরকণ্ঠে বললে, "এ-সব আলোচনা পরে করলেও ক্ষতি হবে না! আমার এ-সর্ব্বনেশে বন মোটেই ভালো লাগছে না, যদি কিছু করবার থাকে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন!"

রামহরি বললে, "যা বলেছ কুমারবাবু! ঐ দেখ না, ওখান দিয়ে আবার একটা মস্ত গোখ্‌রো সাপ আমাদের দেখেই ফণা তুলে ভয় দেখিয়ে বোঁ বোঁ ক'রে ছুটে পালিয়ে গেল! আমি ডাকাতের সঙ্গে, বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে, হাতী আর গণ্ডারের সঙ্গেও লড়তে

রাজি আছি, কিন্তু ঐ সাপ-টাপের সঙ্গে
কিছুতেই আমার পোষাবে না! কোথাও
কিচ্ছু নেই, হঠাৎ দিলে ফোঁস্ ক'রে এক কামড়!
তারপরে সঙ্গে-সঙ্গেই হ'ল অক্কালাভ! এমন
হতচ্ছাড়া জায়গাকে যত শীগ্গির ছাড়তে পারি,
ততই ভালো!"

জয়ন্ত বললে, "সত্যি, এ হচ্ছে একটা অভিশপ্ত ঠাঁই! বিমলবাবু, এখানে দেখছি গোয়েন্দাগিরির চেয়ে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধই বেশী! এদিকে আপনি হচ্ছেন বহুদর্শী, আপনিই বলুন, এখন আমাদের কি করা উচিত।"

বিমল বললে, "আপনার মতন বুদ্ধিমান লোককে আমি আর কি বলব বলুন? তবে এতদূর যখন এসেছি, তখন ঐ স্তূপটার কাছে গিয়ে একবার উঁকিঝুঁকি মারলে মন্দ হয় কি?"

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, "আপনি যে এই কথাই বলবেন, তা আমি আগে থাকতেই জানি। ঐ স্তূপটার কাছে যাবার জন্যে আমার মনও আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছে!"

বিমল বললে, "বেশ, তবে তাই চলুন। কিন্তু সকলকেই বলছি —হুঁসিয়ার! প্রত্যেকেই নিজের নিজের বন্দুক আর রিভলভার প্রস্তুত ক'রে রাখো! ঐ মৃত্তিকা-স্তূপের কাছে গেলে যে-কোন মুহূর্তেই ছুটতে পারে রক্তনদীর বন্যা! ভগবান জানেন, সে-রক্ত হবে কাদের? আমাদের? না শত্রুদের?'

অষ্টম

ঝাঁপা কোটরে সুড়ঙ্গ-পথ

কোন্ দিকে যেতে হবে এটা আর দেখিয়ে দিতে হ'ল না। কারণ কর্দ্দমাক্ত পৃথিবীর উপরে যে-পদচিহ্নগুলোর স্পষ্ট চিত্র লেখা আছে, তারাই মৌন-ভাষায় যেন চীৎকার ক'রেই ব'লে দিতে লাগল, কোন্ দিক থেকে এসেছে এবং কোন্ দিকে ফিরে গিয়েছে শত্রুর দল!

কুমার বললে, "বাঘা রে, ঐ পায়ের দাগগুলো একবার শুঁকে ত্থাখ্! তারপর যে কি করতে হবে তোকে আর নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে না! তারপর আজ তোকেই মহাজন ক'রে আমরা করব তোরই পদাঙ্ক অনুসরণ!"

যাঁরা নিয়মিতভাবে কুকুর পোষেন তাঁরা সকলেই জানেন, কুকুর তার মানুষ-মনিবের অনেক ভাষাই বুঝতে পারে। বিশেষত, আমাদের বাঘা—জাতে দিশী হ'লেও শিক্ষা ও লালনপালনের গুণে সে হয়ে উঠেছিল কুকুর-সমাজের মধ্যে রীতিমত অসাধারণ!

বাঘা থেব্ড়ি খেয়ে মাটির উপরে ব'সে পৃথিবীর উপরে পটাপট্ শব্দে ল্যাজ আছ্ড়াতে আছ্ড়াতে উর্দ্ধমুখে জিভ বার ক'রে কুমারের কথাগুলো সানন্দে শ্রবণ করলে। তারপরেই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মুখ নামিয়ে পদচিহ্ন-আঁকা মাটির উপরটা ভালো ক'রে বারকয়েক শুঁকে নিলে।

তারপর সে আর কোনই ইতস্তত করলে না, মাটির উপরটা শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে চলল অত্যন্ত তাড়াতাড়ি।

বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি অগ্রসর হ'ল বাঘার পিছনে পিছনে।

চতুর্দ্দিকে যে স্তব্ধতা, তাকে ভয়াবহ বললেও অত্যুক্তি হবে না। সহরের বাসিন্দারা—গভীর রাত্রে নগর যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন যে নীরবতাকে অনুভব করেন, তার সঙ্গে এখানকার নীরবতা কিছুই মেলে না। এ যেন মৃত্যুলোকের একান্ত নিস্তব্ধতা, এর মধ্যে জীবনের এতটুকু শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত নেই। এমন কি, বন্য-বাতাসেরও যেন দম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গাছের একটা পাতা পর্য্যন্ত নড়ছে না। সেই সমাধি-জগতের মধ্যে মৃতের মতন পাণ্ডুর চাঁদের চোখের আলো পর্য্যন্ত যেন মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে!

সকলে সেই স্তূপটার কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানেও জীবনের কোন চঞ্চলতাই নেই। খানিক আলো আর খানিক কালো মেখে সেই উঁচু মাটির ঢিপিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন সেই সমতল জগতে একটা অসম্ভব বিস্ময়ের মত!

স্তূপের অনেকখানি পর্য্যন্ত ঢেকে খাড়া হয়ে ছিল একটা বিরাট বটবৃক্ষ। সেই একটিমাত্র বনস্পতিই সেখানে সৃষ্টি করেছে যেন একটি ছোট-খাট অরণ্য। তার নানা শাখা-প্রশাখার তলা থেকে নেমে এসেছে

সুন্দরবনের রক্তপাগল

এমন মোটা মোটা ঝুরি যে দেখলেই মনে হয় সেগুলো কোন বড় বড় গাছের গুড়ি।

বাঘা সেই বিরাট বটগাছের তলায় যেখানে গিয়ে হাজির হ'ল তার চারিদিকেই রয়েছেন এমন ঘন ঝোপঝাপ্ যে, দ'লে দ'লে মানুষও তার ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালে একেবারে অদৃশ্য হয়ে হারিয়ে যেতে পারে।

বিমল পিছন ফিরে ডাকলে, "রামহরি!"

রামহরি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে বললে, "কি খোকাবাবু ?"

—"তোমার মোটমাটের ভিতরে গোটা-তিনেক পেট্রলের লণ্ঠন আছে। চট্পট্ সেগুলো বার ক'রে জ্বালিয়ে ফ্যালো! এই অতিকায়-গাছের তলায় যে নিবিড় অন্ধকার, অন্ধের মত এগিয়ে শেষকালে কি কোন অজগরের পেটের ভেতরে গিয়ে হাজির হ'ব ?"

তিনটে পেট্রলের সমুজ্জ্বল আলোকের আঘাতে সেই মস্ত-বড় বটগাছের তলা থেকে সমস্ত অন্ধকার ছুটে পালিয়ে গেল যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে।

বাঘা তখন হাজির হয়েছে বটগাছের প্রধান গুড়িটার কাছে। তারপরই সে যেন হতভম্বের মতন হয়ে 'কুঁই-কুঁই' শব্দে কেমন-একটা করুণ আর্ত্তনাদ করতে লাগল।

জয়ন্ত এদিক-ওদিক পরীক্ষা ক'রে বিস্মিতস্বরে বললে, "এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! পায়ের চিহ্নগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে একেবারে এই গাছের গুড়ির তলায় এসে।"

সুন্দরবনের রক্তপাগল

পেট্রলের লণ্ঠনগুলোর উজ্জ্বল আলোকের উপরেও উজ্জ্বলতর আলোক সৃষ্টি ক'রে সেখানে জ্ব'লে উঠল সকলকার হাতে বৈদ্যুতিক টর্চ্চ। সেই ঝুপ্‌সি-গাছের তলাটা দিনে-দুপুরেও নিশ্চয়ই কখনো পায়নি তেমন দীপ্তির আভাস।

বৃহৎ বটগাছটার প্রধান গুঁড়ির বেড় হয়তো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাতের কম হবে না!

তারই উপরে হাত বুলিয়ে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে কুমার বললে, "বিমল, বিমল! এখানে একটা খুব সূক্ষ্মভাবে-কাটা দরজার চিহ্ন রয়েছে! গাছের গুঁড়িতে দরজার চিহ্ন! এমন ব্যাপার কল্পনাতেও আনা যায় না!"

সত্য কথা!

জয়ন্ত একটা ধাক্কা মারলে, সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের দেহের খানিকটা ঢুকে গেল ভিতর দিকে—ঠিক যেন একটা দরজার পাল্লার মত!

তারপর সে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। এদিকে, ওদিকে, উপরে ও নীচে টর্চ্চের আলোকপাত ক'রে বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "বিমলবাবু, একি অদ্ভুত ব্যাপার! এই গাছের গুঁড়িটা একেবারে ফাঁপা! তবে এত-বড় গাছটা জ্যান্ত হয়ে আছে কেমন ক'রে?"

রামহরি বললে, "আপনারা বাবু সহুরে-মানুষ! আপনারা তো দেখেন নি, এমন অনেক বড় বড় বটগাছ আছে যাদের আসল গুঁড়ি

ম'রে গিয়ে একেবারে ফাঁপা হয়ে যায়! তবু সে-সব গাছ জ্যান্ত হয়েই থাকে। চারিদিকে এই-যে সব ঝুরি দেখছেন, মাটি থেকে রস শুষে নিয়ে এরাই বাঁচিয়ে রাখে বটগাছদের।"

উজ্জ্বল পেট্রলের আলোকে চারিদিকে তাকিয়ে বোঝা গেল, সেই বৃক্ষ-কোটরের ভিতরটাকে একখানি বড়-সড় ঘর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেবল সেই ঘরের উপরদিকে ছাদের আবরণ নেই, ঊর্দ্ধমুখে তাকালে দেখা যায় চাঁদের আলোমাখা এক টুকরো আকাশ।

ইতিমধ্যে আর একটা নূতন আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে জয়ন্ত। কোটরের একপ্রান্তে মাটির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে একখানা মাঝারি-আকারের দরজার পাল্লা। খুব বড় একটা কড়া ধ'রে উপরদিকে টানবামাত্র দরজাটা বাইরের দিকে খুলে এল বেশ সহজেই।

জয়ন্ত নীচের দিকে উঁকি মেরে দেখে বললে, "একসার সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গিয়েছে দেখছি। এখন আমাদের কি করা উচিত?"

বিমল বললে, "এখন আমাদের পাতাল-প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই।"

রামহরি বললে, "তোমার কি গোঁয়ার্তুমি করবার বয়স এখনো গেল না খোকাবাবু? পাতালে প্রবেশ করব বলছ যে, কিন্তু দলে-ভারি ডাকাতরা যদি আমাদের আক্রমণ করে?"

—"আমরাও আত্মরক্ষা আর প্রতি-
আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি।
আমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে আছে অটোমেটিক
বন্দুক আর অটোমেটিক রিভলভার—খুব সম্ভব
ডাকাতদের কারুর কাছেই যা নেই। আমরা পাঁচজনে
দু'শো জন ডাকাতকে বাধা দিলেও দিতে পারি।"

জয়ন্ত বললে, "আপনারা এইখানে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করুন। আগে আমি একলা চুপি চুপি নীচে নেমে গিয়ে এখানকার হালচালটা কিছু কিছু বোঝবার চেষ্টা ক'রে আসি গে।" ব'লেই পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নেমে অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ উপরকার কারুর মুখেই কোন কথা নেই। কেবল গাছের কোটরের কোন্‌খান থেকে একটা তক্ষক বিশ্রীকণ্ঠে বার-কয়েক ডেকে উঠল।

মিনিট ছয়-সাত পরে জয়ন্ত আবার সিঁড়ির উপরকার ধাপে এসে দাঁড়াল। বললে, "বিশেষ-কিছুই পাওয়া গেল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই পেলুম একটা বেশ লম্বা আর চওড়া সুড়ঙ্গ-পথ। তার চারিদিকটাই বাঁধানো। পরীক্ষা ক'রে বুঝলুম এ-সুড়ঙ্গটা নতুন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তার ভিতরে জনপ্রাণীর সাড়া নেই, বিরাজ করছে ঠিক সমাধির স্তব্ধতা। সুড়ঙ্গের শেষ-প্রান্তে গিয়ে পেলুম আর একটা দরজা, কিন্তু তার পাল্লাদুটো ওধার থেকে বন্ধ।

দরজার উপরে কাণ পেতেও জীবনের কোন লক্ষণই আবিষ্কার করতে পারলুম না। ঐ দরজার ওধারে কি আছে জানিনা, কিন্তু আপাতত আমরা এই সুড়ঙ্গের ভিতরে বোধহয় নিরাপদেই প্রবেশ করতে পারি।"

বিমল বললে, "বেশ, তাহ'লে আপনি পথ দেখান।"

জয়ন্ত আগে আগে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল এবং তার পশ্চাৎ-অনুসরণ করলে বিমল, কুমার, মাণিক, রামহরি ও বাঘা। সুড়ঙ্গের ভিতরে গিয়ে হাজির হয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে কুমার বললে, "বাঃ, এরা যে এখানে বেশ পাকা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছে দেখছি। কিন্তু সুড়ঙ্গটার ভিতর দিয়ে এগুলে আমরা কোথায় গিয়ে পড়ব?"

বিমল বললে, "আমার বিশ্বাস, উপরে যে স্তূপটা দেখে এসেছি, মাটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গের সাহায্যে আমরা হয়তো তারই ভিতরে প্রবেশ করতে পারি। হয়তো ঐ স্তূপের তলায় পুরানো ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে। হয়তো ধ্বংসাবশেষের কোন কোন জায়গা অল্পবিস্তর মেরামত ক'রে নিলে এখনো সেখানে মানুষ বাস করতে পারে। দৈবগতিকে এটা জানতে পেরেই মধু-ডাকাত এখানে এসে গেড়েছে তার গোপন আস্তানা!"

মাণিক বললে, "কিন্তু পাতালের ভিতরে ডাকাতরা আলো-বাতাস পাবে কেমন ক'রে?"

বিমল বললে, "যারা পৃথিবীর চোখে

ধূলো দেবার জন্যে এত আয়োজন করতে পেরেছে, তারা কি আর ওদিকে দৃষ্টি দেয়নি? হয়তো তারা উপর থেকে স্তূপের স্থানে স্থানে খুঁড়ে ভিতরে আলো আর বাতাস যাবার পথ ক'রে নিয়েছে।"

এমনি কথাবার্ত্তা হচ্ছে, হঠাৎ পিছন দিকে একটা উচ্চ শব্দ হ'ল। সবাই একসঙ্গে চম্‌কে ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, সুড়ঙ্গের যে-মুখ দিয়ে তারা ভিতরে প্রবেশ করেছে সেই মুখটার উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত জুড়ে আছে অনেকগুলো বিষম মোটা-মোটা লোহার গরাদে! আবার তাদের পিছনদিকে সেইরকম আর-একটা শব্দ এবং আবার তারা চমকে ফিরে অবাক হয়ে দেখলে, সুড়ঙ্গের অন্যদিকেও মেঝে থেকে ছাদ পর্য্যন্ত জুড়ে এসে পড়েছে তেমনি মোটা মোটা কতকগুলো লোহার গরাদে!

তাদের পিছু হঠবার বা সামনে এগুবার দুই পথই বন্ধ! তারা যেন পশুশালার লোহার খাঁচার মধ্যে বন্দী!

অকস্মাৎ সেই সুড়ঙ্গ-পথ এক অতি তীব্র, তীক্ষ্ণ ও রোমাঞ্চকর হা-হা-হা-হা অট্টহাসির পর অট্টহাসির রোলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল! সত্যি কথা বলতে কি, সে বীভৎস হাসির বর্ণনা তার ঐ হা-হা-হা-হা রবের দ্বারা বোঝানো যায় না—কারণ, সে যেন চামুণ্ডারূপিণী প্রচণ্ড কোন নারীর খল-খল-খল-খল অট্টহাসি!

তিন-তিনটে প্রদীপ্ত পেট্রলের লণ্ঠন সেই

সুন্দরবনের রক্তপাগল

সুড়ঙ্গ-পথের শেষ-প্রান্তকেও দিয়েছিল অন্ধকারের কবল থেকে মুক্তি।

দেখা গেল, সুড়ঙ্গ-পথের অন্য-প্রান্তের বন্ধ দরজাটা খুলে গিয়েছে এবং সেই দরজার সামনে এসে আবির্ভূত হয়েছে পনেরো-কুড়িটা সুদীর্ঘ মূর্ত্তি! এতদূর থেকেও লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোতেও তাদের কারুর চেহারা স্পষ্ট ক'রে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু এটা বেশ আন্দাজ করতে পারা যাচ্ছিল যে, সেই মূর্ত্তিগুলোর প্রত্যেকটাই রীতিমত যমদূতের মতই দেখতে!

কে যে হাসছে বোঝা যাচ্ছিল না তাও। হঠাৎ সেই নারীকণ্ঠের তীব্র হাসি থেমে গিয়ে জেগে উঠ্‌ল, খন্‌খনে মেয়ে-গলায় একটা কৌতুকপূর্ণ স্বর—"ওরে পুঁচ্‌কে বিমল! আমার গলা শুনে তুই কি আমাকে চিনতে পারছিস্?"

বিমল শান্ত অথচ অবিচলিতকণ্ঠে বললে, "চিন্‌তে পারছি বৈকি অবলাকান্ত! অমন বিরাট দেহে অমন কুৎসিত নারীকণ্ঠ ভগবান বোধহয় পৃথিবীর দ্বিতীয় কোন পুরুষকে দান করেন নি! তুমি মধু-ডাকাত ব'লেই আত্মপরিচয় দাও কিংবা বৃদ্ধের ছদ্মবেশই ধারণ কর, কিন্তু তোমার অস্তিত্ব আমি এখানে আসবার আগেই অনুমান ক'রে নিয়েছি। সেই 'জেরিণার কণ্ঠহারে'র মামলায় শেষপর্য্যন্ত হেরে গিয়েও তুমি আমাদের ফাঁকি দিয়ে লম্বা দিয়েছিলে, এ-কথা কি আমি কোনদিন ভুলব? আজ যে আবার

তোমাকে মুঠোর ভেতরে পেয়েছি, এটা জেনে আমার মন আনন্দে নেচে উঠছে!"

আবার সেই খনখনে গলায় খল-খল অট্টহাসি! তারপরই হঠাৎ হাসি থামিয়ে অবলাকান্ত চীৎকার ক'রে বললে, "বলিস্ কি রে? তুই আমাকে মুঠোর ভেতর পেয়েছিস্? না আমি তোকে আর তোর স্যাঙাতদের বুনো কুকুর-শেয়ালের মতন লোহার খাঁচায় বন্দী ক'রে ফেলেছি? খালি তুই কেন, মস্ত-বড় গোয়েন্দা ব'লে যে নাম কিনতে চায়, সেই জয়ন্ত-গাধাকে তোর মতন আগেও আমি একবার নিজের হাতের মুঠোর ভেতরে পেয়েছিলুম, আজও আবার পেয়েছি! এক ঢিলে আজ আমি দুই পাখী মারতে চাই! তোদের দু'জনের সঙ্গে আর যারা আছে তাদের আমি উল্লেখযোগ্য ব'লে মনেই করি না! তবে এইসঙ্গে সেই হোঁৎকা পুলিস-কর্ম্মচারী সুন্দরটাকে জালে ফেলতে পারলে আমার প্রতিহিংসা আজ একেবারে সার্থক হ'ত!"

জয়ন্ত বললে, "অবলাকান্ত, তোমার বাজে ভড়্‌পানি শোনবার জন্যে আমরা প্রস্তুত নই। তুমি কি করতে চাও, তাই বল।"

—"আমি কি করতে চাই? আমি কি করতে চাই? তা শুনলে তোদের দেহের রক্ত হিম হয়ে যাবে! বিজন-জমিদারের 'লাঞ্চ' আক্রমণ করবার আগে যদি আমি তোদের খবর জানতে পারতুম, তাহ'লে আগে-থাকতে সেইখানেই ব্যবস্থা করতুম তোদের টিপে

মেরে ফ্যালবার জন্যে! তারপরেই যখন হঠাৎ তোদের দেখা পেলুম, তখনই বুঝলুম যে, তোদের মতন ছিনে-জোঁক্ শেষপর্য্যন্ত না দেখে ছাড়বে না। তারপর আজ এই বিপথে আমার আড্ডার এত কাছে বন্দুকের শব্দ শুনেই আমার জানতে বাকি রইল না যে, এখানেও হয়েছে তোদেরই অশুভ আবির্ভাব! আমি বুদ্ধিমানের মতন তখন আর কোন গোলমাল না ক'রে তোদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করবার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখলুম। আমি জানতুম, তোরা এখানে আসবি, আসবি, আসবি! হা-হা-হা-হা-হা-হা!"

জয়ন্ত অধীরকণ্ঠে বললে, "তোমার প্রলাপের উচ্ছ্বাস আর আমাদের ভালো লাগছে না! তুমি এখন কি করতে চাও তাই বল!"

—"আমি কি করতে চাই? আমি কী করতে চাই? আমি যা করতে চাই, সেটা তোদের কাছে একটুও ভালো লাগবে না! আমার প্রতিহিংসা সর্ব্বদাই দৌড়োয় উল্টো পথে! আমি তোদের হাতে মারব না, ভাতে মারব! বুঝেছিস্?"

জয়ন্ত বললে, "ভাতে মারবার কথা কি বলছ? তোমার কাছে আমরা ভাত খেতে আসিনি!"

আবার অট্টহাসি হেসে অবলাকান্ত বললে, "তাই নাকি? তাহ'লে সংক্ষেপেই শোন্, আমি কি করতে চাই। তোরা ঐ লোহার খাঁচাতেই বন্দী হয়ে থাকবি—দিনের পর দিন—যতদিন না পটল তুলিস্!

তোদের একফোঁটা জল খেতে দেব না, এককণা খাবারও দেব না! ঐ খাঁচার ভেতরেই ছট্‌ফট্ করতে করতে অনাহারে তোরা ম'রে থাকবি! ওখান থেকেই সবাই মিলে তোরা যত-খুসি চ্যাঁচাতে পারিস্, তোদের গলার আওয়াজ এই পাতাল ফুঁড়ে পৃথিবীর উপরে জেগে ওঠবার কোন পথই নেই। হা-হা-হা-হা-হা!"

দাঁতে দাঁত চেপে কুমার নিম্নস্বরে বললে, "বিমল! জয়ন্তবাবু! মাণিকবাবু! রামহরি! শয়তানের আস্ফালন আর সহ্য হচ্ছে না! মরতে হয় মরব, কিন্তু এখন শত্রুনিপাত করবার সুযোগ ছেড়ে দেব কেন?"

বিমল বললে, "ঠিক বলেছ! ছোঁড়ো সবাই একসঙ্গে আটোমেটিক বন্দুকগুলো!"

পর-মুহূর্ত্তেই একসঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা আটোমেটিক বন্দুক গর্জ্জন করতে লাগল বারংবার! কেবল বন্দুকগুলোর শব্দে নয়, অনেকগুলো মনুষ্যকণ্ঠের ভয়াবহ আর্ত্তনাদে সুড়ঙ্গ-পথের সেই বদ্ধ আবহাওয়া যেন বিষাক্ত হয়ে উঠল!

জয়ন্ত উন্মত্তের মত চীৎকার ক'রে বললে, "তোরা যদি যুদ্ধ করতে চাস্, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্! লড়াই ক'রে মরতে আমরা রাজি আছি! আয়, দেখি কাদের বন্দুকের প্রতাপ বেশী?"

মনুষ্য-কণ্ঠ থেকে আর-কোন উত্তর শোনা

গেল না, অল্পক্ষণ খানিক ঝটাপটি ও হুড়োহুড়ি শব্দের পর শোনা গেল কেবল একটা দরজা সজোরে বন্ধ ক'রে দেওয়ার আওয়াজ।

জয়ন্ত আবার প্রাণপণে চীৎকার ক'রে বললে, "ফের যদি তোরা ঐ দরজা খুলিস্, আমাদের কাছ থেকে এই-রকম অভ্যর্থনাই লাভ করবি! আমরা মরতে-মরতেও তোদের মেরে তবে মরব!"

কিন্তু আর কারুর কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল না। সেই বন্ধ দরজা বন্ধ হয়েই রইল, কেবল দেখা গেল, দরজার সামনে মাটির উপরে নিশ্চল হয়ে প'ড়ে আছে চারটে মনুষ্য-মূর্ত্তি! নিশ্চয়ই তারা কেউ আর বেঁচে নেই! হয়তো আহত হয়েছে আরো অনেকগুলো মানুষ, কিন্তু তারা কোনগতিকে আশ্রয় নিয়েছে ঐ বন্ধ দরজার নিরাপদ অন্তরালে!

খানিকক্ষণ কেটে গেল নীরবতার মধ্য দিয়ে। হয়তো সকলেই তখন নিজের নিজের ভীষণ পরিণামের কথা চিন্তা করছিল।

কেবল রামহরি বিমলকে সম্বোধন ক'রে বললে, "খোকাবাবু, তুমি যখন সঙ্গে আছ, তখন আমি জানি যে, আমাদের কারুর কোনই ভয় নেই। এখন কেমন ক'রে এই খাঁচার বাইরে যাই বল দেখি? এর লোহার ডাণ্ডাগুলো এত মোটা যে, হাতী এলেও এদের কিছুই করতে পারবে না! হে বাবা বিশ্বনাথ! বুড়ো-

বয়সে অন্নজল না খেয়ে মরবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই! তুমি আমাদের একটা উপায় ক'রে দাও বাবা!" ব'লেই সে দুই হাত জোড় ক'রে বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশে বারংবার প্রণামের পর প্রণাম করতে লাগল।

বিমল হাসতে হাসতে সহজস্বরেই বললে, "ভাই রামহরি, বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছায় এখান থেকে পালাবার উপায় আমাদের সঙ্গেই আছে।"

জয়ন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "কি-রকম?"

বিমল বললে, "খুব সোজা উপায়। কিন্তু সবাইকে আমার কথামত কাজ করতে হবে।"

—"বলুন।"

—"সকলে মিলে এখানে চীৎকার ক'রে কথা বলতে থাকুন আর মাঝে মাঝে প্রাণপণে গলা ছেড়ে গান সুরু ক'রে দিন। আর নিবিয়ে দেওয়া হোক্ পেট্রলের আলোগুলো। আমি এখন চাই খালি অন্ধকার আর কোলাহল!"

—"আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না!"

—"আমি সব জায়গাতেই প্রস্তুত হয়েই যাই। অনেক দেখে দেখে আমার যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয়েছে। হঠাৎ কেউ আমাকে বিপদে ফেলতে পারবে না। আমার সঙ্গে কি আছে জানেন? একটি অতি-সূক্ষ্ম প্রথম-শ্রেণীর উকো! এই উকো দিয়েই লোহার

সুন্দরবনের রক্তপাগল

ডাণ্ডা কেটে আমি এখান থেকে সকলকার পালাবার পথ আবার খুলে দেব। কিন্তু বলা তো যায় না, এই অদ্ভুত সুড়ঙ্গ-পথের কোন্ অজানা রন্ধ্রের পিছনে আছে কোন্ দুরাত্মার সাবধানী-চক্ষু! আর লোহার উপরে উকো ঘস্‌লেই একটা শব্দের সৃষ্টি হবে। সেই শব্দটা ঢাকবার জন্যেই সকলকে গোলমাল করতে অনুরোধ করছি। তারপর যদি সেই শব্দ শুনে অন্ধকারে ওদিককার দরজা খোলার আওয়াজ হয়, তখন কেউ যেন একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়তে একটুও ইতস্তত না করেন।"

... ...

সেই পাতালপুরীর ভিতরে ব'সে রাত্রি কি দিন কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। আসলে তখন হচ্ছে, শেষ রাত্রি।

বিমল তার উকোর সাহায্যে একটা মোটা লোহার ডাণ্ডা একেবারে কেটে ফেললে। তারপরে মুখ তুলে বললে, "জয়ন্তবাবু, এইবারে কিন্তু দয়া ক'রে আমার কয়েকটি উপদেশ শুনতে হবে। অবশ্য এই উপদেশ মানা আর না-মানা, সে হচ্ছে আপনাদের অভিরুচি।"

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, দেখছি আজকের নাটকের নায়ক হচ্ছেন আপনিই! এখানে হয়তো আমাদের অনাহারেই ম'রে প'ড়ে থাকতে হ'ত—যদি আপনাকে আজ সঙ্গে না পেতুম।

আপনি আজ যা বলবেন, সেটা হবে আমাদের কাছে আদেশের মতন !"

বিমল বললে, "জয়ন্তবাবু, আপনার এতটা বেশী বিনয় প্রকাশ করবার কোনই দরকার নেই। আমি যা বলব তা হবে সোজা কথাই !.........দেখুন, পালাবার জন্যে আমরা এখানে আসিনি, আমরা এখানে এসেছি একদল দুর্দ্ধর্ষ বোম্বেটে গ্রেপ্তার করতে। পালাতে আমরা এখনি পারি, কারণ পথ আমি সাফ্ ক'রে দিয়েছি। কিন্তু আপনারা এখান থেকে পালাতে চান, না এই দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করতে চান ?"

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, ঐ অবলাকান্তর ওপরে আমার অনেকদিনের ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। ও আমাদের বার বার ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে ! ওকে আর ওর দলকে যদি গ্রেপ্তার করতে পারি, তাহ'লে সে সুযোগ আমি নিশ্চয়ই ছাড়ব না ! তবে ব্যবস্থা যা দেখছি, এখান থেকে আমাদের পালাবার পথ খোলা রয়েছে, কিন্তু অবলাকান্তদের গ্রেপ্তার করবার কোনই সুযোগ নেই !"

জয়ন্তের কথার কোন জবাব না দিয়ে বিমল বললে, "কুমার, আজ একটুখানি জাগ্রত হ'তে পারবে ?"

কুমার হাসতে হাসতে সেলাম ক'রে বললে, "যো হুকুম, মহারাজ !"

বিমল বললে, "শোনো কুমার

এখান থেকে বিজনবাবুদের 'লাঞ্চ' বোধহয় বেশী দূরে নেই! তোমাকে সেইখানে যেতে হবে। আমাদের পালাবার পথ খোলা থাকলেও আমরা এইখানেই আপাতত অচল শিবের মতই ব'সে রইলুম। এখন হয়তো বাইরে গিয়ে দেখবে, ঘুট্ঘুটে অন্ধকার। কিন্তু তোমার কুকুর-বন্ধু বাঘাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—সে তোমাকে নিশ্চয়ই পথ চিনিয়ে দেবে।"

কুমার বললে, "আমাকে কী যে করতে হবে এখনো সেটা বুঝতে পারছি না।"

বিমল বললে, "তোমাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না। বাঘাকে ইঙ্গিত করলেই সে তোমাকে নিশ্চয়ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, 'লাঞ্চ' যেখানে আছে সেইখানেই। 'লাঞ্চে'র উপরে তিন-ডজন বন্দুকধারী পুলিসের সেপাই আছে! তার উপরেও আছে আরো পনেরো-বিশজন লোক। তুমি সমস্ত কথা ব'লে তাদের সবাইকে সশস্ত্র হয়ে এইখানে আসবার জন্যে অনুরোধ করবে।"

মাণিক বললে, "কিন্তু বিমলবাবু, পথ যখন খোলা রয়েছে, তখন আপাতত সবাই তো আমরা এখান থেকে স'রে পড়তে পারি! তারপর 'লাঞ্চ' থেকে লোকজন নিয়ে এসে আবার আমরা চেষ্টা ক'রে দেখব এই শয়তানদের গ্রেপ্তার করতে পারি কিনা?"

জয়ন্ত রুক্ষস্বরে বললে, "মাণিক, তোমার আজ হ'ল কি বল দেখি? তুমি আজ বারবার নির্ব্বোধের মতন কথা কইছ! এখান থেকে আমরা সবাই যদি স'রে পড়ি, তাহ'লে এই পাতালপুরীর বাসিন্দারা তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠবে, সেটা কি আন্দাজ করতে পারছ না? তারপর ফিরে এসে আর কি তাদের কোন পাত্তা পাবে?"

বিমল বললে, "ঠিক বলেছেন জয়ন্তবাবু! আমি কি চাই জানেন? আমরা এইখানেই ব'সে থাকব, বেশী বিপদ দেখলেই এখান থেকে সেই মুহূর্ত্তেই স'রে পড়ব—কারণ আমাদের পালাবার পথ খোলাই আছে! কিন্তু আমরা তো পালাবার জন্যে এখানে আসিনি, আমরা এসেছি মধু-ডাকাত বা অবলাকান্ত আর তার দলবল গ্রেপ্তার করতে! কুমার চ'লে যাক্ বাঘাকে নিয়ে! সে 'লাঞ্চে'র উপরে গিয়ে খবর দিক্, আমাদের কী অবস্থা! তারপর কেউ যথাসময়ে আসতে পারে ভালোই, না পারে, আমরা নিজেদের পথ নিজেরাই ক'রে নেব-অখন!"

জয়ন্ত বিমলকে আলিঙ্গন ক'রে বললে "দাদা, তুমি তো গোয়েন্দা নও, আমিই হচ্ছি ডিটেক্‌টিভ! কিন্তু তুমি ভাই আজ্‌কে আমাকেও হারিয়ে দিলে!"

বিমল বললে, "কে যে হে'রে যাবে আর কে যে হারবে না, সে-কথা নিয়ে আমি কোনই মাথা ঘামাচ্ছি না! তুমি হ'চ্ছ আমার বন্ধু,

তুমি যদি হুকুম কর, আমি সব-কিছু করতে পারি!"

জয়ন্ত বললে, "আপনি যদি হুকুমের কথা বলেন, সেটা অত্যন্ত অন্যায় হবে। আপনি আমাদের চেয়ে কত বেশী দেখেছেন! যে-লোক মঙ্গলগ্রহে গিয়ে ফিরে এসেছে তাকে আমরা কীই বা হুকুম করব?"

শীঘ্রই এর পরের ঘটনা প্রকাশিত হবে এই সিরিজের "কুমারের বাঘা-গোয়েন্দা" গ্রন্থে।

নবম

তারপর কি হ'ল?

চারিদিকে প্রখর দিবালোক ছড়িয়ে সূর্য্য তখন উঠেছে আকাশের অনেকখানি উপরে।

কিন্তু সূর্যোর আলোকের এককণাও সুড়ঙ্গ-পথের মধ্যে প্রবেশ করেনি। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তারা উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল একেবারে নীরবে। তাদের প্রত্যেকেরই হাতের বন্দুক যে-কোন মুহূর্ত্তে অগ্নি উদ্গার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে। সুড়ঙ্গ-পথের ওদিককার দরজাটা যদি কেউ খোলবার চেষ্টা করে কিংবা ওদিকে যদি কোন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায়, তাহ'লে প্রত্যেকেই একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়তে একটুও বিলম্ব করবে না।

কিন্তু অবলাকান্ত বা তার কোন অনুচর একবারও দরজা খোলবার বা উঁকিঝুঁকি মারবার চেষ্টা করলে না! দরজা খুললেই যে কি-রকম বিপদের সম্ভাবনা, একটু আগেই তারা তার যে নমুনা পেয়েছে তাদের পক্ষে তাইই হয়েছে যথেষ্ট। আর এ-কথাও তারা বোধহয় ভাবছে, বন্দীরা যখন লোহার খাঁচার ভিতরে, তাদের পালাবার কোন উপায়ই যখন নেই এবং অন্ন ও জল থেকে বঞ্চিত ক'রে তাদের যখন হত্যাই করা হবে, তখন আর দরজা খুলে পাহারা দিতে গিয়ে যেচে বিপদকে ডেকে আনবার দরকার কি?

সুন্দরবনের রক্তপাগল

... ••• ...হঠাৎ সুড়ঙ্গ-পথের মুখে একটা শব্দ শোনা গেল। সাবধানী-পায়ের শব্দ!

তারপরই একটা চাপা কণ্ঠস্বরে শোনা গেল—

"হুম্! এ যে বেজায় অন্ধকার বাবা!"

মাণিক উৎফুল্লকণ্ঠে ব'লে উঠল, "আমাদের সুন্দরবাবু এসেছেন! পায়ের শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে সুন্দরবাবু একলা আসছেন না!"

ইতিমধ্যে বিমল সুড়ঙ্গের ভিতর-দিকে প্রবেশ করবার জন্যে ওদিককারও একটা লোহার ডাণ্ডা উকো ঘ'সে কেটে ফেলেছে। সেই পথ দিয়ে বেরুতে বেরুতে বিমল বললে, "জয়ন্তবাবু, এইবারে পেট্রলের লণ্ঠনগুলো জ্বালিয়ে ফেলুন।"

আলোকের ধাক্কায় অন্ধকার যখন অদৃশ্য হ'ল তখন দেখা গেল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন সুন্দরবাবু। তারপর আবির্ভূত হ'ল কুমার ও বাঘা! তারপর পদশব্দের পর পদশব্দ তুলে ভিতরে নেমে আসতে লাগল দলে-দলে সশস্ত্র পুলিসের লোক।

খাঁচার ভিতরকার বন্দীরাও তখন বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জয়ন্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, "সুন্দরবাবু, আপাতত কোন কথা বলবার বা গোলমাল করবার চেষ্টা করবেন না। খাঁচার কাটা-ডাণ্ডার ফাঁক দিয়ে গ'লে চুপিচুপি আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন!"

জয়ন্ত ও বিমল সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হ'ল।

তারপর তারা সুড়ঙ্গ-প্রান্তের সেই বন্ধ-দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে তখনো পড়েছিল কতকগুলো মৃতদেহ! সেদিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে দরজার উপরে কাণ পেতে তারা শুনতে লাগল, কিন্তু দরজার ওদিকে নেই কোন-রকম ধ্বনির অস্তিত্ব।

জয়ন্ত ধীরে ধীরে ঠেলা দিতে দরজা গেল খুলে।

দেখা গেল একখানা বেশ বড় ঘর। ঘরখানা যে বহুকালের পুরাতন প্রথম দৃষ্টিতেই সেটাও অনুমান করা যায়।

কিন্তু ঘরের মধ্যেও জনপ্রাণী নেই।

বিমল ঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, "জয়ন্তবাবু, ওদিককার দেওয়ালে কি-একখানা কাগজ মারা রয়েছে দেখছেন?"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কাগজখানার উপরে টর্চ্চের আলোক নিক্ষেপ ক'রে উত্তেজিত ও উচ্চস্বরে পড়তে লাগল:

"ওহে জয়ন্ত-গাধা, ওরে বিমল-শেয়াল! তোরা কি ভেবেছিস্ আমি অভিমন্যুর মতন নির্ব্বোধ? এই পাতাল-পুরীতে ঢোকবার পথ রেখেছি আর পালাবার পথ রাখিনি? এখান থেকে বাইরে বেরুবার খালি একটা নয়, অনেকগুলো পথই আছে! পাহারাওয়ালা খালি তোদেরই নেই, আমারও আছে পাহারাওয়ালা! আমার পাহারাওয়ালারা দিনে-রাতে বনে বনে পাহারা দিয়ে বেড়ায়! তাদেরই মুখে খবর পেলুম, সুন্দর-ছুঁচো একদল ছাতুখোর

সুন্দরবনের রক্তপাগল

লাল-পাগড়ী নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আমার এই আড্ডার দিকে ছুটে আসছে। এ-যাত্রা আবার তোরা আমাকে ফাঁকি দিলি বটে, কিন্তু এত সহজে ধরা পড়বার ছেলে নই আমিও। তোরা যখন এই শূন্য পাতালপুরীতে ব'সে হা-হুতাশ করবি, আমি তখন থাকব বহুদূরে—বহুদূরে। আমার ঠিকানা যদি চাস্ তাহ'লে আবার তোরা আমার সঙ্গে দেখা করিস্। তখন তোদের আমি খুব ভালো করেই অভ্যর্থনা করবার চেষ্টা করব। আর আমার সঙ্গে আবার আলাপ করবার সখ যদি তোদের মিটে গিয়ে থাকে, তাহ'লেও জেনে রাখিস্, কমলী তোদের ছাড়বে না। আজ থেকে আমি রইলুম তোদের পিছনে পিছনে মূর্ত্তিমান শনির মত। ইতি অবলাকান্ত।" শেষ-দিকটা পড়তে পড়তে জয়ন্তের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল অত্যন্ত করুণ!

বিমল সকৌতুকে উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগল!

রামহরি বললে, "কী যে হাসো খোকাবাবু, গা যেন জ্বলে যায়!"

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, এখন আপনি কি করবেন?"

সুন্দরবাবু ফোঁস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল বললেন, "হুম্!"

কুমার বললে, "বাঘা, তুই কিছু বলবি না?"

বাঘা মুখ তুলে বললে, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!"